জয়মঙ্গল-অষ্টগাথা

ভিক্ষু সত্যপাল

গ্রন্থ-শীর্ষ	:	জয়মঙ্গল-অট্ঠগাথা
গ্রন্থকার	:	অধ্যাপক ডঃ ভিক্ষু সত্যপাল
প্রকাশক	:	সাধারণ সম্পাদক আন্তর্জাতিক সাধনা কেন্দ্র, বুদ্ধগয়া
প্রকাশ-কাল	:	১০.০২.২০০৮
মুদ্রণের ব্যয় ভার বহন করেছেন	:	শ্রী প্রদীপ কুমার বড়ুয়া ও তদীয় সহধর্মিনী শ্রীমতী মাধবী বড়ুয়া সোদপুর, কোলকাতা (প. ব.)
সংস্করণ	:	প্রথম (১০০০ কপি)
কম্পোজিং ও ডিজাইনিং	:	শ্রী সরিৎ বড়ুয়া
কপি-রাইট	:	গ্রন্থকার (সর্বাধিকার)
মুদ্রক	:	Sanchi Press, Delhi Tele : 42141457; 9311790504
গ্রন্থকারের অস্থায়ী বাসস্থান	:	C-2 (29-31), Probyn Road (Chatra Marg) University of Delhi Delhi – 110007 (India) Tele: 011 – 27667003 Email: bhikshusatyapala@live.com buddhatriratnamission@yahoo.com

Printed and donated for free distribution by
The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation
11F., 55 Hang Chow South Road Sec 1, Taipei, Taiwan, R.O.C.
Tel: 886-2-23951198 , Fax: 886-2-23913415
Email: overseas@budaedu.org
Website:http://www.budaedu.org
This book is strictly for free distribution, it is not for sale.
এই বই সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিতরণের জন্য, বিক্রয়ের জন্য নহে।

সমর্পন-পত্র

'জয়মঙ্গল-অট্ঠগাথা'

শীর্ষক গ্রন্থটি

আমার পরমারাধ্য দীক্ষাগুরু

ঁডঃ রাষ্ট্রপাল মহাস্থবিরের

স্মৃতি-রক্ষার্থে সকৃতজ্ঞ চিত্তে

সাদরে

সমর্পিত হল

!

গ্রন্থকার

ভিক্ষু সত্যপাল

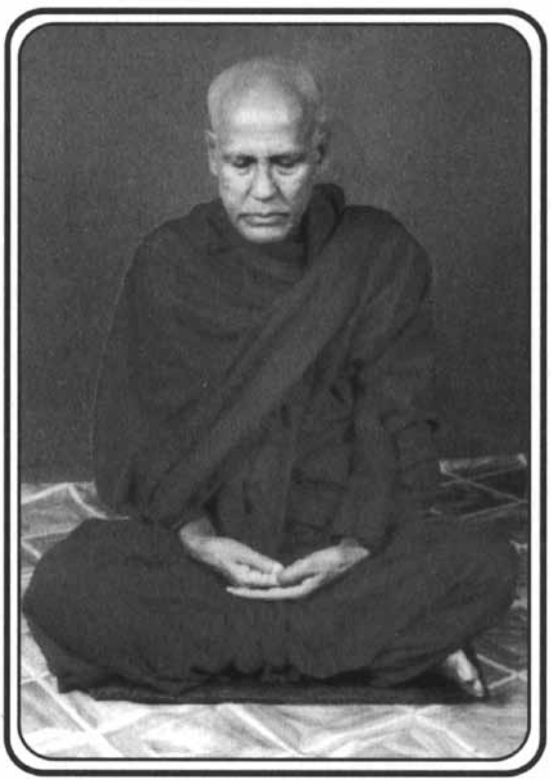

আবির্ভাব : ২৫/০৪/ ১৯৩০; তিরোধান : ২২/১২/ ২০০৮

পরম শ্রদ্ধেয় ডঃ রাষ্ট্রপাল মহাস্থবির

বিদর্শনাচার্য, প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি

আন্তর্জাতিক সাধনা কেন্দ্র, বুদ্ধগয়া

অর্থদাতাদের পরিচয়

কোলকাতাস্থ সোদপুর নিবাসী শ্রী প্রদীপ বড়ুয়া, এবং তদীয় সহধর্মিণী শ্রীমতী মাধবী বড়ুয়া সদ্ধর্মে নিবেদিত- প্রাণ উপাসক-উপাসিকা, সদ্ধর্মের প্রচার-প্রসার ও শ্রীবৃদ্ধিকল্পে তাঁদের ত্যাগশীলতা প্রশংসার দাবী রাখে। তাঁদের আর্থিক বদান্যতায় অনেক ধর্ম ও সেবা প্রতিষ্ঠানের পুষ্টি সাধিত হয়েছে। প্রকাশিত হয়েছে ধর্মীয় গ্রন্থ। এ পর্যন্ত, যে সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে তাঁদের দানের উজ্জ্বল নিদর্শন রয়েছে সেগুলি হল আন্তর্জাতিক সাধনা কেন্দ্র ও আনন্দ বিহার, বুদ্ধগয়া; ধর্মাধার বৌদ্ধ বিহার, নাটাগড়, সোদপুর; মোহনপুর কুঞ্জবন বিহার; জ্ঞানালংকার বুড্ঢিষ্ট সংঘে এক কাঠা জমি, দিগবেড়িয়া; রেঙ্গুন ধর্মদূত বিহার, বার্মা; সুহৃদা অনাথ ও দুঃস্থ সেবা কেন্দ্র, শ্রীলংকা; শান্তিনিকেতন আম্বেদকর বুড্ঢিষ্ট ওয়েলফেয়ার মিশন, বোলপুর; ইছাপুর তথাগত বিহার; সূর্যপুর ত্রিরত্ন বুড্ঢিষ্ট ফাউণ্ডেশন; সাঁতরাগাছি বুড্ঢিষ্ট ওয়েলফেয়ার এসোশিয়েশন; বাংলাদেশ বুদ্ধ বিহার, বুদ্ধগয়া; সিদ্ধার্থ ইউনাইটেড সোস্যাল ওয়েলফেয়ার মিশন; শীলকুপ কেন্দ্রীয় চৈত্য বিহার, বাঁশখালী, বাংলাদেশ; পূর্ব আঁধারমানিক শ্রদ্ধানন্দ বিহার, বাংলাদেশ; এবং ওয়াট মগধ বিপস্সনা সেন্টার, বুদ্ধগয়া প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ইহা ছাড়াও আন্তর্জাতিক সাধনা কেন্দ্র, বুদ্ধগয়ার সাধারণ সম্পাদক ড. বরসম্বোধি ভিক্ষু বিরচিত "মৃত্যুর পরে" বইটি প্রকাশনার ব্যয়ভার বহন করে সদ্ধর্ম প্রচারে তাঁরা বলিষ্ট ভূমিকা পালন কররেছেন। সমাজ ও ধর্মের গঠন মূলক যে কোন সভা সমিতি ও অনুষ্ঠানাদিতে তাঁদের উদার হস্ত বহুজনের প্রেরণার সঞ্চার করে।

তাঁরা উভয়ে বুদ্ধগয়া আন্তর্জাতিক সাধনা কেন্দ্র, মহাবোধি সোসাইটি

অফ ইণ্ডিয়া, বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্র, কোলকাতা, প্রভৃতির আজীবন সদস্য-সদস্যা। ধর্মাধার সেবা কমিটি ও বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্রের কোষাধ্যক্ষ পদে বৃত থেকে প্রদীপবাবু দীর্ঘদিন যাবৎ সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করছেন। বর্তমানে তিনি আন্তর্জাতিক সাধনা কেন্দ্র-বুদ্ধগয়ার আমন্ত্রিত সদস্য।

সংসার জীবনে এ দম্পতির রয়েছে একটি ছেলে ও একটি মেয়ে। তাঁরা উভয়ে উচ্চ শিক্ষা সমাপ্ত করে সরকারী চাকরি নিয়ে স্বীয় স্বীয় কর্মক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত।

প্রদীপবাবুর পৈতৃক নিবাস চট্টগ্রামের রাউজান থানাধীন কদলপুর গ্রাম। বর্তমানে সোদপুর কল্যাণ নগর, বড়ুয়া পাড়ায় স্থায়ী আবাস গড়ে তুলেছেন। বিগত ০৮/১১/২০০৮ তারিখে এই কেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত মহাস্থবির বরণ উৎসবের অঙ্গরূপে বিমোচিত আমারই বিরচিত 'বুদ্ধের দিব্যদৃষ্টি ও আজীবিক উপক' শীর্ষক গ্রন্থের প্রকাশনার আর্থিক ব্যয়ভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছেন। বেশ কয়েক জন পাঠক-পাঠিকার মাধ্যমে ঐ গ্রন্থের বিষয়বস্তুর প্রশংসা পেয়ে তারা উভয়ে প্রোৎসাহিত হন। তারা তাদের আনন্দ চাপা রাখতে পারেন নি। গ্রন্থকারের কাছে আনন্দ ব্যক্ত করার প্রক্রিয়ায় আরেকটি ধর্মগ্রন্থ প্রকাশনার দায়িত্ব স্বেচ্ছায় তারা গ্রহণ করে ফেলেন। সাহিত্যকারের কাছে তার কৃতির এই তো শ্রেষ্ঠ উপহার। এর চেয়ে বড় উপহার আর কি হতে পারে?

সদ্ধর্ম প্রচারে প্রসারে তাদের উভয়ের যৌথ ভূমিকা বড়ই প্রশংসনীয়। সদ্ধর্মহিতৈষী মাত্রেরই কাছে ঐ ভূমিকা অনুকরণীয়ও বটে। পালি সাহিত্যে অনেক প্রকারের দান ও দানকর্মের সুপরিণামের কথা চর্চিত হয়েছে। তবে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ধর্মদানকে। শাস্তা

নিজেই ধর্মদানের গুরুত্ব সম্পর্কে বলেছেন--- **ধম্মদানং সব্বদানং জিনাতি**। অর্থাৎ ধর্মদানের পরিণাম অপর সব প্রকারের দানের চেয়ে অধিক। ধর্মগ্রন্থ প্রকাশনের কাজে সহায়কের ভূমিকা পালন করার মাধ্যমেও প্রকাশক ধর্মদান করে থাকেন। এ ধর্মদানজনিত অনন্ত পুণ্য রাশির প্রভাবে এ দম্পতি ও তাঁদের পরিবারস্থ প্রত্যেকের উত্তরোত্তর মঙ্গল কামনা করছি।

শুভার্থী

তারিখ : ১০/০২/২০০৯ ভিক্ষু সত্যপাল
তিথি : মাঘী পূর্ণিমা আন্তর্জাতিক সাধনা কেন্দ্র, বুদ্ধগয়া

Suniti Kumar Pathak,
(M.A., P.R.S.)
Kavyatirtha, Sutta-Visarada, Puranaratna
Diploma in Chinese
Former Chairman
Department of Indo-Tibetan Studies
Visva-Bharati University (Retd.)
Ex-Research Professor
The Asiatic Society, Kolkata.

Residence:
Akash-Deep, Abanpalli
Santiniketan- 731235
West Bengal
Phone 03463-262508

-মুখবন্ধ-

আজ থেকে ২৬৩২ বছর আগে শাক্যপুত্র গৌতমের আবির্ভাব ঘটেছিল। বাল্যকাল থেকে উজাগর চিত্তে গৌতম তাঁর পরিবার, পরিজন ও পরিবেশের সঙ্গে সাবলীলভাবে গড়ে উঠেছিলেন। অবশ্যি পরবর্তীকালের সাহিত্যে লোকোত্তর গৌতম বুদ্ধকে নিয়ে শ্রদ্ধায় অতিশয় উক্তির অভাব নেই। গৌতম সে যুগের ভারতবর্ষের আচার-অনুষ্ঠান ভাবনা-চিন্তার মাঝে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছিলেন। সেদিক থেকে গৌতমবুদ্ধ জীবনে ভূয়োদর্শিতার পরিচয় সর্বত্র মিলে। সে কথাগুলি বৌদ্ধ সাহিত্যে নানা প্রসঙ্গে ছড়িয়ে বেড়িয়েছে। বুদ্ধিজীবী বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা বুদ্ধের জীবনকথা অর্থাৎ বায়োগ্রাফী বলতে যা চান তা বৌদ্ধ সাহিত্যের কোথাও তেমন নাই। কারণ ভারতবর্ষের মানুষের কাছে জীবন ও মৃত্যু নদীর স্রোতের মত হাওয়ার চাপে প্রবাহিত জলতরঙ্গের মতো। সেখানে পশ্চিমী গ্রীক ও রোমান পরম্পরার প্রভাব নাই। অতএব জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে যৎসামান্য যে জীবন্ত পরিসর মিলে, তার বহুমুখী ধারায় বিকাশ অপরের কাছে যেমন আকর্ষণের নিজের কাছেও সেগুলি বলে কম আদরের নয়।

শাক্যবংশের বিশেষত্ব ছিল যে ঐ গোষ্ঠীর জনেরা মনের দিক থেকে তখনকার অন্যান্য জনেদের থেকে উন্নতমানের ছিল। চেতনার বিকাশের পরিণামে গৌতমের গৃহত্যাগ। কেন না, গৃহীর জীবন শুধু

নিজের স্ত্রী, পুত্র, মা ও বাবা, খুব বেশি হলে পরিবার পরিজনে সীমাবদ্ধ। গৌতমের কাছে তা অতি সঙ্কীর্ণ বলে মনে হয়েছিল। তাই তিনি বহুজনের কল্যাণের অভীপ্সা নিয়ে গভীর রাত্রে স্ত্রী-পুত্র ও পিতাকে ছেড়ে অনিশ্চিত আলোকের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সেদিনের প্রেরণার ইঙ্গিত করে বলেছেন, --- শুনিয়াছি তারি লাগি রাজপুত্র পরিয়াছে ছিন্নকন্থা। বিষয়ে বিরাগী পথের ভিক্ষুক। (এবার ফিরাও মোরে। ২৩শে ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩০০)।

মঙ্গলের সন্ধানে যাঁরাই ছুটে বেড়ান তাঁরাই মঙ্গল্য। মঙ্গল ও মঙ্গল্য শব্দ দুটির প্রয়োগ পালি ভাষায় নিকায় ও অট্ঠকথায় প্রায়ই উল্লেখ আছে। শব্দটি গোড়াতে বৈদিক জনেরাও ব্যবহার করতেন। শব্দ শাস্ত্রের মতে 'মঙ্গ' ধাতু তিনটি অক্ষর সঙ্কেতে লেপিত হলেও একটি স্বরের বাহক। যার মানে হোল শুভ সূচনা করা। সম্ভবত পুরানো আমলে মঞ্জ, মঞ্চ, মণ্ড প্রভৃতি যৌগিক ধ্বনির শব্দ গুলি বিশেষ বিশেষ দ্যোতনা নিয়ে শুভ, শোভন, সুষীম অর্থে ব্যবহার করা হোত। বহুজনিক ভারতবর্ষের পুরাতন শব্দের প্রয়োগ আর তার নীতার্থ পৃথকভাবে অনুসন্ধান করলে এক অভিনব বিমিশ্র সংস্কৃতির পরিচয় মিলে। গৌতমবুদ্ধ অবলীলায় ঐ সকল শব্দের তাঁর সমকালীন প্রয়োগকে স্বীকার করেছিলেন। তাই মঙ্গলগাথা জয়ের সূচক হয়ে উঠেছে। সেগুলি অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে হিত, সুখ ও কল্যাণের দ্যোতনা বহন করেছে।

অনেকের মনে হতে পারে যে, জয়মঙ্গল-অট্ঠগাথায় পরিত্ত, আটানাটীয়সুত্ত, অঙ্গুলিমালসুত্ত, মেত্তসুত্ত গুলি কেন ধরা হয়েছে। মঙ্গলসুত্তকে নিয়ে এই সংকলন যথেষ্ট নয় কি? পূজনীয় বিদ্বান ভদন্ত ভিক্ষু সত্যপাল ঐ প্রসঙ্গের যথার্থ নিরসন করে দীর্ঘায়ু বালকের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রতি পরিত্ত-এর আড়ালে এই ধরণের বাস্তব কথা

রোচক হয়ে রয়েছে। এখন পরিত্ত-গাথা বা প্রবচন পাঠের প্রয়োজন কোথায়?

ধম্মপদে বলা হয়েছে 'অত্তা হি অত্তনো নাথো'। তা হলে 'বন্ধন থেকে পরিত্রান' কথার মূলে কি? সেখানে কুশল কর্ম, অকুশল কর্ম তথা পুণ্য ও পাপের প্রসঙ্গ। 'চেতনা হি কম্মং' কথার নেয়ার্থ স্পষ্ট। সত্তগণ কর্ম বলে যা করে তা ঐ সত্ত্বের চেতনার প্রক্রিয়া। চেতনা সত্ত্বমাত্রেরই সংস্কারের হেতুফলের নিয়মে বাঁধা। অতএব ঐ বন্ধনের থেকে পরিত্রাণের উপায় হোল পরিত্ত গাথা পাঠ করা।

কর্মের সঙ্গে সংস্কারের ঘনিষ্ঠতা যতটা অধ্যাত্ম, তার চেয়ে বেশি জৈবিক ও নৈতিক (ইংরাজীতে বাওটিক এবং এথিক্যাল)। কেননা যে কোন কর্ম করলেই তার ছাপগুলি সংস্কার ঘটায়। কর্মের চেতনায় প্রেরণা ও ক্রিয়াকারিতা, যেমন ঘটনা, তাদের অনুসঙ্গী সংস্কারগুলির উদ্ভব তেমন একের পর এক পৌর্বাপর্ব ঘটনা। এই নিয়মে বাঁধা প্রতীত্যসমুৎপাদের শৃঙ্খলিত হেতু-ফল প্রত্যয়ের সম্বন্ধ। সেখানে পরিত্ত-গাথা পাঠ, মঙ্গল-গাথা পাঠ, মেত্ত-সুত্ত এক এক প্রতিলোম প্রক্রিয়া।

সেদিক থেকে আচার্য ভদন্ত ভিক্ষু সত্যপাল সাধারণ বাঙ্গালীর পঠন-পাঠনের যে উপাদান প্রচারে উদ্যোগী হয়েছেন তার মূল্যায়ন সামান্য দু-চার কথায় তুলে ধরা দুঃসাধ্য। জয়মঙ্গল-অট্ঠগাথার ভূমিকায় শ্রদ্ধেয় ভদন্ত তাঁর বৈয়ক্তিক জীবন জিজ্ঞাসার ইঙ্গিত করেছেন। তাঁর এই সাথর্ক প্রয়াসে বাঙ্গালা ভাষাভাষী মানুষ-মাত্রই লাভবান হবেন, তাতে সংশয় নাই। শুধু এই গাথা-গুলির বাঙ্গলায় অনুবাদ যথেষ্ট নয় বলে, আচার্য ভদন্ত প্রতি গাথার পালি শব্দের পাশাপাশি বাঙ্গলা প্রতিশব্দ দিয়ে তাঁর ব্যাখ্যান স্রোতমুখে বিস্তার করেছেন। এ ধরণের

প্রয়াস এখনকার পালি গ্রন্থের বাঙ্গলায় রূপান্তরের এক সুগম বিধান। কৌতূহলীদের কৌতূহল নিবারিত হবার সম্ভাবনা রাখে। তাঁর এই অনুবাদ-শৈলী আক্ষরিক শুধু নয়, বৈজ্ঞানিকও। তাঁর এই মহতী প্রচেষ্টা সার্থক হয়ে উঠবে, বাঙ্গলা-ভাষাভাষীদের কাছে নূতন দিগন্তের সূচনা হবে। আচার্য ভদন্তকে সশ্রদ্ধ প্রণাম।

ভাদ্র পূর্ণিমা
তারিখ: ১৫/০৯/২০০৮
বুদ্ধাব্দ ২৫৫২

বিনীত
সুনীতিকুমার পাঠক

প্রসঙ্গ কথা

বহুবছর পূর্বেকার ঘটনা একদিন অবসর সময়ে সাহিত্য চর্চা করা কালে হঠাৎ পাশের কামরা হতে ভোরে সুললিত কণ্ঠে পালিতে উচ্চারিত গাথার সুমধুর ধ্বনি ভেসে আসে আমার কানে। দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। স্পষ্ট বুঝতে পারলাম ধ্বনিটি ভাই সরিতের কামরা হতেই আসছে। এটাও স্পষ্ট হতে চলেছিল ঐ শব্দ কম্প্যুটর চালিত যন্ত্র হতে আসছে। কণ্ঠস্বর এতই কর্ণসুখকর ও হৃদয়গ্রাহী ছিল যে আমি অনায়াসে তার কামরার দিকে যাই। গাথার শব্দগুলো ছিল জয়মঙ্গল-অট্ঠগাথার। ভাইকে বলি আবার শুরু থেকে শোনাতে। সে তার ব্যবস্থা করে দেয়। শুরুতে ঢোল-মৃদঙ্গ, খোল-করতাল, কাঁসার ঘণ্টা, বাদ্যযন্ত্র ও শঙ্খাদির ধ্বনি শুনি। তা দিয়ে ধর্মীয় পরিবেশ সৃজনের আয়োজন হয়েছে। এর পর ভেসে আসে দেবতা-আমন্ত্রণের গাথা। দেবতা-আবাহন-গাথা শেষ হবার পর পরিত্রাণ-সূত্র আরম্ভ হয়। সূত্র উচ্চারণের সুস্পষ্ট স্বরে, সুরে ও শৈলীতে এটা সহজেই বোঝা যায় এ শব্দ কোন ভারতীয়ের নয়। যারা একবার মাত্র হলেও শ্রীলংকীয় ভিক্ষুর পরিত্রাণ পাঠ শুনেছেন তারা নিঃসন্দেহে বলবেন এ সূত্রপাঠও শ্রীলংকানিবাসী ভিক্ষু-সংঘের। পালি ছন্দে গাথাগুলির অর্থ জেনে জেনে সুমার্জিতভাবে গাইলে যে কত হৃদয়গ্রাহী হয়, তা সেদিন প্রথম বুঝতে পারি। এর মাধ্যমে বুঝতে মোটেই অসুবিধা হয় না যে এ সূত্রের প্রতি এবং বুদ্ধের প্রতি শ্রীলংকাবাসীর শ্রদ্ধা কত অসীম। সে কথা কাউকে বলে কয়ে বোঝাতে হয় না।

আমাদের ভারতীয়রাও বিশেষত যুবক ভিক্ষু-শ্রামণেররা সূত্র-পাঠ অবশ্যই করেন তবে অর্থ জেনে নয়। সূত্র পাঠ করা হয় দায় সারার

কারণে মাত্র। তোতা-ময়নার মতো আওড়িয়ে যাবার ক্ষমতা অর্জনের উদ্দেশ্যে তা করা হয়। সূত্রের প্রতিটি শব্দের গভীরে নিহিত অর্থ জানার ও তার রসে সিক্ত হবার ধৈর্য যেন আমাদের মধ্যে মোটেই নেই।

বুদ্ধবাণীর শুধুমাত্র মন্ত্রবৎ উচ্চারণের মাধ্যমে বাচক যদি সুফল পেতে পারে, তবে উচ্চারণ-শুদ্ধির মাধ্যমে তার আবৃত্তি করা হলে তার ফল নিশ্চয়ই অধিকতর সুফলদায়ী হবে। উচ্চারণ শুদ্ধির জন্যে প্রয়োজন শব্দের সম্যক্ অর্থজ্ঞান। যেখানে জ্ঞান সেখানে সত্য, আর যেখানে সত্য সেখানে সুখ। যেখানে সুখ সেখানেই সমৃদ্ধি। তাই সংকল্প নিয়েছিলাম বাংলাভাষীদের হিতার্থে পরিত্রাণ-সূত্রগুলোর বাংলা-অনুবাদ করার।

একসাথে সব কটির অনুবাদ করা সম্ভবপর নয়। জয়মঙ্গল-অট্ঠগাথার অনুবাদ করে এ কাজের শুভারম্ভ করলাম মাত্র। পাঠকগণের কাছ হতে এ ব্যাপারে প্রেরণা পেলে শেষ কাজটাও কিছুটা এগিয়ে যাবে বলে আশা পোষণ করি।

গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি তৈরী হলে তা বিদগ্ধ সুধীজনের কাছে পরিবেশনীয় হয়েছে কিনা তার মূল্যায়ন করার জন্যে বিশ্বভারতীর অবসরপ্রাপ্ত আদরনীয় অধ্যাপক সুনীতিকুমার পাঠক মহোদয়কে অনুরোধ করি। শত ব্যস্ততা থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁর সম্মতি প্রদান করেন। অত্যল্প সময়ের মধ্যে তিনি তাঁর পারখী নজরে অমূল্য মূল্যাংকন পাঠান। তার যোগ্য সম্মান প্রদর্শনার্থে তা এতে মুখবন্ধরূপে সংযোজিত হল। তাঁর এ মহোপকারের জন্যে তাঁকে সকৃতজ্ঞ চিত্তে ধন্যবাদ জানাই। তাঁর মাধ্যমে সাহিত্য-জগতের নিরন্তর শ্রীবৃদ্ধি হউক কামনায় তাঁর সুস্থ ও দীর্ঘায়ু কামনা করি।

পালি পিটক সাহিত্যের বাংলায় অনুদিত অনুবাদ-সাহিত্যে এমন প্রয়াস এই প্রথম হল মনে করি। ভাই সরিতের আন্তরিক প্রচেষ্টার সুপরিণামে এ গ্রন্থের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপিটি কম্প্যুটরীকৃত বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত হয়ে এবং যথাসম্ভব নির্ভুল প্রারম্ভিক গ্রন্থাকারে আর শ্রীমান চেতরাজ মহোদয়ের সহৃদয়তার কারণে অল্প ব্যয়ে তাঁর দিল্লীস্থ সাঁচী প্রেস হতে মুদ্রিত হয়ে পাঠকের পরশ স্পর্শ পেতে সমর্থ হয়েছে। এ সুবাদে এদের প্রত্যেকে ধন্যবাদের পাত্র হয়েছেন। উপাসক শ্রী প্রদীপ কুমার বড়ুয়া ও তার সহধর্মিনী শ্রীমতী মাধবী বড়ুয়ার আর্থিক সহৃদয়তার কারণে এর পাণ্ডুলিপিটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে দেখে যার-পর নাই আনন্দিত। তাঁর সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধির অশেষ আশীর্বাদ জানাই। এমন প্রয়াসে ভুলভ্রান্তি থাকতে পারে। তা ধরিয়ে দিয়ে এর এক নির্ভুল ভাবী সংস্করণ প্রকাশের প্রেরণা পেলে গ্রন্থকার বাধিত থাকবে।

। ভবতু সব্বমঙ্গলং।

তিথি : মাঘী পূর্ণিমা — ভিক্ষু সত্যপাল

তারিখ: ১০/০২/২০০৮ — গ্রন্থকার

ভূমিকা

দীপঙ্কর বুদ্ধের আবির্ভাবকালে তাঁর পদপ্রান্তে নিজেকে লুটিয়ে দিয়ে সুমেধ নামক এক ব্রাহ্মণ তাপস বহুজন-হিতায় বহুজন-সুখায় ভাবী বুদ্ধ হবার অটুট সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন। ঐ হতে নিরন্তর চার অসংখ্য কল্পকাল প্রয়াসরত থাকার পর সুপরিণামে তিনি শেষ বারে মানবযোনিতে শাক্যকুলের রাজা শুদ্ধোদনের পুত্র বোধিসত্ত্ব সিদ্ধার্থরূপে জন্মেছিলেন। সম্বোধি প্রাপ্তির ঐ প্রয়াসক্রমে তিনি মহাভিনিষ্ক্রমণ করেন। দুষ্কর তপশ্চর্যার ত্যাগের পর উরুবেলার বোধিবৃক্ষের ছায়াতলে মারবিজয়ী হয়ে তিনি বুদ্ধ হন। বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হয়ে তিনি ক্রমান্বয়ে পঁয়তাল্লিশ বছর বহুজন-হিতার্থে ও বহুজন-সুখার্থে ভেদাভেদ নির্বিশেষ বর্ষাকালীন মেঘ-মালা হতে ঝরে পরা অশেষ বারিধারার ন্যায় নিরন্তর ধর্মোপদেশ দান করেছেন। দুঃখী প্রাণীর দুঃখ-লাঘবার্থে লুপ্তপ্রায় জীবনবোধ তথা ধর্মকে অভূতপূর্ব তপশ্চর্যার মাধ্যমে তিনি আবিষ্কার করেন। তিনি দুর্লভ 'সদ্ধর্ম' প্রচার ও প্রসারের জন্য এবং তার সুরক্ষায় সংঘের সংগঠন করেন। কালের করালপ্রবাহেও সংঘকে সুসংগঠিত করে রাখার জন্য তিনি বিনয়ের বিধান দেন। ঠিক যেভাবে দূরদর্শী অভিভাবক তাঁর পুত্র-কন্যা নাতি-পতি বা পৌত্র-প্রপৌত্রাদির ভবিষ্যতের জন্য ধনসম্পদ রেখে যান, ঠিক সেভাবে সঙ্ঘের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন অভিভাবকের মত ভগবান বুদ্ধ তাঁর জীবিতকালে ও তাঁর অবর্তমানে শিষ্য-অনুশিষ্য-সমূহকে তাদের প্রত্যাশিত-অপ্রত্যাশিত বিপদ থেকে ত্রানের উপায়রূপে বিনয়ের শিক্ষাপদগুলি দিয়েছিলেন। ভগবান বুদ্ধও ঠিক তেমনি এক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন অভিভাবকের মত তাঁর বর্তমান ও ভাবী শিষ্য-

অনুশিষ্যসমূহের জীবনকে প্রত্যাশিত-অপ্রত্যাশিত বিবিধ বিপদ হতে মুক্ত রাখার জন্যে আরো একটি মোক্ষম রক্ষাকবচ দেন। সেটি হল সত্যের রক্ষা-কবচ। সংসারে সবচেয়ে শক্তিশালী তত্ত্ব বলে যদি কিছু থেকে থাকে তা হল সত্য। তার উপরে কোন কিছুকে বুদ্ধ কোনদিন গুরুত্ব দেন নি।

বুদ্ধ ছিলেন সত্যের সন্ধানী, সত্যের পূজারী, সত্যের আবিষ্কারক, সত্যের সংরক্ষক। সত্যের মূর্ত প্রতীক ছিলেন তিনি। সিদ্ধার্থের ঊনত্রিশ বছরের গৃহী জীবনে নানা ধরণের অদ্ভূত ঘটনা ঘটেছিল। পালি সাহিত্যে ওসবকে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয় নি। বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির ক্ষণ হতে আরম্ভ করে তাঁর মহাপরিনির্বাণ প্রাপ্তির কাল অবধি পঁয়তাল্লিশ বছরের সুদীর্ঘ ও কর্মব্যস্ত আয়ুষ্কালের প্রতিটি বছরে, প্রতিটি মাসে, প্রতিটি সপ্তাহে, প্রতিটি দিনে, এমন কি প্রতিটি পলে অবশ্যই কিছু না কিছু ঘটেছে। সাধারণ প্রাণীর সব কিছুই সাধারণ হয়ে থাকে। অসাধারণ মানুষের জীবনে অধিকাংশ ঘটনা অসাধারণ হয়। দেখতে সাধারণ মানুষ মনে হলেও অসাধারণ মানুষের জীবনে ঘটনার পরিণাম ব্যাপক ও সুদুরগামী হয়ে থাকে। ওসবের ব্যাপকতার মাত্রার বিশ্লেষণ করেই তাদের অসাধারণত্বের অনুমান ও মূল্যাংকন করা হয়।

ভগবান বুদ্ধের জীবনে ঘটেছে এমন অসাধারণ ঘটনার সংখ্যা অসংখ্য। এসবের যা কিছু ধর্মধর আনন্দ আর বিনয়ধর উপালি শুনেছিলেন বা জানতেন আর তার যতটুকু তাঁদের স্মৃতিতে সুরক্ষিত ছিল তার কিছুটা পরে তিপিটকে লিপিবদ্ধ রয়েছে। আর অধিকাংশেরই বোধ হয় উল্লেখ নেই। যা লিপিবদ্ধ আছে তার সব কটি স্মৃতিতে ধরে রাখতে পারেন এমন স্মৃতিধরের সংখ্যা আজ সমুদ্র-সৈকত হতে নখাগ্রে তোলা বালির পরিমাণের মতই অতি অল্প।

স্মৃতিমান সুত্রধর ও বিনয়ধর আজ থাকলেও তাঁরা সহজলভ্য নন। তেমন কাউকে পেলেও শ্রোতাসমূহের কর্মব্যস্ত জীবনে তাঁদের মাধ্যমে ওসবের সব কটিকে শোনার সময় নেই। সময় থাকলেও ধৈর্য নেই। এসব কথা মনে রেখে অতীত-অনাগত কালের ত্রিশরণাপন্ন জীবনকে সমৃদ্ধিময় করার উদ্দেশ্যে বুদ্ধদেশিত কিছু বিশেষ সূত্র আবৃত্তি করার পরম্পরার সূত্রপাত ভগবান বুদ্ধের সময়েই ঘটেছিল। তার ফলে শিষ্য ও প্রশিষ্যেরা অপ্রত্যাশিত আপদ-বিপদ থেকে রক্ষা পেতেন। আজও সুরক্ষা মিলে, সুখ লাভ হয়। পরিচিত-অপরিচিত আর্ত-পীড়িত ভীত-ত্রস্ত দুঃখী-জনের যেই মহাকারুণিক বুদ্ধের শরণাপন্ন হয়েছেন তার বা তাদের তাৎকালিক ত্রাণদানের উদ্দেশ্যে ভিক্ষু-সংঘকে কিছু বিশেষ সুত্র-পাঠের আদেশ দিয়ে আগ্রহী শ্রোতাদের কাছে পাঠানো হোত। কখনও বা বুদ্ধ নিজে সশিষ্য চলে যেতেন। এ প্রসঙ্গে এক ব্রাহ্মণ দম্পতির নবজাতক পুত্রকে তার অবশ্যম্ভাবী প্রাণহানিজনিত (আসন্ন) বিপদ হতে রক্ষার উদ্দেশ্যে ঐ ব্রাহ্মণের বাসভবনে ভিক্ষু-সংঘের উপস্থিতিতে সপ্তাহকাল অবিরাম সূত্রপাঠের আদেশ দান ও সপ্তমদিনে তাদের বাড়ীতে আয়োজিত সূত্রপাঠে শাস্তার অংশগ্রহণের ঘটনাটি বড় উল্লেখনীয়।

বুদ্ধের সমকালীন ঘটনা দীঘালম্বক নামক গ্রামের এক ব্রাহ্মণ পরিবারের দুই সন্তান গৃহত্যাগের পর আটচল্লিশ বছর তপশ্চর্যা করেন। তার পর ঐ দুয়ের একজন সন্ন্যাস-ধর্ম ত্যাগ করে সাংসারিক ধর্মে ফিরে আসেন। কৃষিকর্মের মাধ্যমে ধন-সম্পত্তি অর্জনের পর বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হন। এক পুত্র-সন্তানের প্রাপ্তি ঘটে ; মাতাপিতা উভয়ে খুশীতে সন্তানের নাম রাখেন দীর্ঘায়ু। সন্তান প্রাপ্তির কিছুদিন পর ঐ সন্তানের জেঠু তপস্বী তাদের গ্রামে বেড়াতে আসেন। দীর্ঘায়ুর মাতাপিতা নিয়ে ঐ তাপসের আশ্রমে যান। তাঁরা উভয়ে প্রণাম

জানালে তাপস আশীর্বাদ দেন।

প্রণামান্তে সন্তানকে তাপসের চরণে রেখে সন্তানের মঙ্গল-কামী হয়ে আশীর্বাদ যাচনা করেন। এবার কিন্তু ঐ তাপস একেবারে নিরুত্তর থাকেন। তাপসের ঐ ভাব লক্ষ্য করে সন্তানের মাতাপিতা ভারী দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হন। তাপসের এভাবে থাকার কারণ জানার জন্যে তাঁরা পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। অনেক পীড়াপীড়িতে থাকতে না পেরে ঐ তাপস বলেন--- 'এর মৃত্যু অতি সন্নিকট। আশীর্বাদ দিলে তা বৃথা যাবে। তাই বিবশ হয়ে নিরুত্তর আছি।' তাপসের ঐ বিবশতা দেখে দীর্ঘায়ুর মাতাপিতা আরও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হন। ঐ আসন্ন বিপদ হতে সন্তানকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে অন্য কোন উপায় বের করার অনেক অনুনয়-বিনয় করেন ঐ সন্তানের মাতাপিতা।

শেষে ঐ তাপস বলেন--- 'তোমরা ভগবান বুদ্ধের কাছে অবিলম্বে যাও। তিনি অবশ্যই এর কোন একটা উপায় বের করে দেবেন।' তাপসের নির্দেশে তখনি তাঁরা সন্তানকে নিয়ে ভগবান বুদ্ধের দর্শন লাভে বেরিয়ে পড়েন। সৌভাগ্যবশত শাস্তা তখন দীঘালম্বকেরই এক আরণ্য-কুটিতে বিহার করছিলেন।

বুদ্ধের সাক্ষাৎ লাভের পর তাঁরা উভয়ে শাস্তাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানান। শাস্তাও তাঁদের আশীর্বাদ দেন। এর পর তাঁরা দীর্ঘায়ুকে শাস্তার চরণস্পর্শ করিয়ে পাশে রাখেন। সন্তানের মঙ্গলকামী হয়ে শাস্তার আশীর্বাদ যাচনা করেন। এবার শাস্তা নীরব থাকেন। তাদের অনেক অনুনয়-বিনয়ের পর শাস্তাও তাঁর নীরবতার কারণ স্পষ্ট করে বলেন-- 'বালকের মৃত্যু অতি সন্নিকট।'

ঐ আসন্ন মৃত্যুর কবল হতে সন্তানকে রক্ষার জন্যে মাতাপিতা উভয়ে কান্নাকাটি করে শাস্তার কাছে কাতর অনুরোধ করেন। দিব্যদৃষ্টি বিস্তার

করে শাস্তা বালকের অতীত জন্মের কার্য-কারণগুলি দেখতে পান। এর পর তিনি বাসস্থানের প্রাঙ্গণে মুখ্য দরজার সম্মুখে মণ্ডপ বানিয়ে ওতে ভিক্ষু-সংঘের মাধ্যমে সপ্তাহকাল অবিরাম (পরিত্রাণ) সূত্র পাঠের আয়োজন করার নির্দেশ দেন ।

শাস্তার নির্দেশে বিশাল ভিক্ষু-সংঘ তাদের নিবাসস্থলে যান। ভিক্ষু-সংঘ তাঁদের ঠিক মাঝখানে শিশু-সন্তানকে রেখে আরক্ষা দানের ব্যবস্থা করে পরিত্রাণ সূত্র-পাঠ আরম্ভ করেন। সপ্তম দিনে শাস্তা নিজে এসে পরিত্রাণ-পাঠে অংশ গ্রহণ করেন। বুদ্ধের সাথে অগণিত দেবগণও বুদ্ধ-প্রমুখ ভিক্ষু-সংঘের চার পাশে আকাশে বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে এক অভেদ্য প্রাকার তৈরী করে পরিত্রাণ-পাঠে অংশ গ্রহণ করেন। বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষু-সংঘের সাথে দেবগণও বালক দীর্ঘায়ু কুমারকে তার আসন্ন মৃত্যু-সংকট কাটিয়ে ওঠার জন্যে আশীর্বাদ করে এক অদৃশ্য রক্ষা-কবচ প্রদান করেন।

ঠিক সাত দিনের দিন যক্ষরাজ কর্তৃক আদেশ প্রাপ্ত হয়ে অবরুদ্ধক নামক এক যক্ষ ঐ বালককে প্রেতলোকে নিয়ে যেতে হাজির হয়। ঐ যক্ষ বালকের কাছে যাবার জন্য কয়েক বার প্রয়াস চালায়। কিন্তু বিশাল দেবসঙ্ঘের, অনুত্তর ভিক্ষু-সংঘ ও সম্যক্ সম্বুদ্ধের দিব্য ঋদ্ধি-বলে তৈরী ঘেরাবন্ধনী ভেদ করে বালকের কাছে যাওয়া ঐ অবরুদ্ধক যক্ষের পক্ষে সম্ভবপর হয়ে উঠেনি। সপ্তম দিনের রাত্রি শেষ না হওয়া অবধি বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষু-সংঘ পরিত্রাণ-সূত্র পাঠ করেন। অবরুদ্ধক যক্ষ তাঁর প্রয়াসে অসফল হয়ে ক্ষুণ্ন মনে স্বস্থানে ফিরে যান।

তারপর শাস্তা সুগত আশীর্বাদ করেন--- 'এই বালক এখন হতে একশত বিশ বছর বাঁচবে।' শাস্তা নিজে দীর্ঘায়ুর নাম বদলে নতুন নাম দেন আয়ুবর্দ্ধন (**আয়ুবড্ঢন**)।

এভাবে আর্ত-পীড়িত ও সন্তপ্ত-পরিতপ্ত প্রাণীর আসন্ন বিপদ থেকে রক্ষার জন্য এবং বাঞ্ছিত মনোকামনার আশু ফলপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে আয়োজিত পরিত্রাণ-পাঠের প্রসঙ্গের উল্লেখ পালি পিটক সাহিত্যে একাধিক রয়েছে। পরিত্রাণ-সূত্রের অন্তর্ভুক্ত সুত্তগুলোর মধ্যে রতন-সুত্ত (খুদ্দকনিকায়), খন্ধ-পরিত্ত (অঙ্গুত্তরনিকায়), মোর-পরিত্ত (খুদ্দকনিকায়), ধ্বজগ্ন-পরিত্ত (সংযুত্তনিকায়), আটানাটিয়-সুত্ত (দীঘনিকায়), অঙ্গুলিমাল-সুত্ত (মজ্ঝিমনিকায়) ও সীবলী-সুত্ত (খুদ্দকনিকায়) আদি মুখ্য স্থান পায়। এসবের পাঠ যে শুধু পর-রক্ষার্থে হয়ে থাকে তা নয়, আত্মরক্ষার্থেও হয়। আত্মরক্ষার জন্য এ সবের পাঠের নির্দেশ শাস্তা স্বয়ং দিয়েছেন। এর পরবর্তী কোন এক পর্যায়ে মেত্ত-সুত্ত (খুদ্দকনিকায়) এবং মঙ্গল-সূত্ত (খুদ্দকনিকায়) এ দুটি সুত্রের নামও পরিত্রাণ-সূত্রের তালিকাভুক্ত হয়। ভগবান বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর আয়োজিত প্রথম সঙ্গীতিতে বুদ্ধবাণীর সংগ্রহ, বিভাজন, সম্পাদন ও সঙ্গায়ণ-কালে উপরোক্ত সূত্রগুলিকে পাঁচটি ভিন্নভিন্ন নিকায়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। মিলিন্দপ্রশ্ন গ্রন্থেও (আনুমানিক ২য় খৃঃ পূর্বাব্দ) উপরোক্ত সূত্রগুলোর চর্চা পরিত্রাণসূত্ররূপে হয়েছে। পরবর্তীকালে জয়মঙ্গল-অট্ঠগাথাকেও পরিত্রাণসুত্রের তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তবে এ সূত্রের মূল রচয়িতা কে, কখন, কেন বা কার প্রেরণায়, বা কোন প্রসঙ্গে এটিকে পরিত্রাণ-সূত্রের অন্তর্ভুক্ত করা হয় তা জানার নির্ভরযোগ্য তথ্য আজ জানা নেই।

পিটক-সাহিত্যে সংগৃহীত বুদ্ধবচনের শৈলী তিন প্রকারের। যেমন---গাথা বা পদ্য, গদ্য ও গদ্য-পদ্য মিশ্রিত। পরিত্রাণ-সুত্রের উপরোক্ত সূত্রগুলোর অধিকাংশই গাথাময়। ভাষাগত ও সরলতার দৃষ্টিতে মঙ্গল-সুত্ত, মেত্ত-সুত্ত, জয়মঙ্গল-অট্ঠগাথা স্থবিরবাদীদের কাছে অত্যধিক জনপ্রিয়। ছন্দের দৃষ্টিতে জয়মঙ্গল-অট্ঠগাথা সব চেয়ে অধিক

জনপ্রিয়। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় স্থবিরবাদী শ্রীলংকা, লাওস, কম্বোডিয়া, থাইল্যাণ্ড, ম্যানমার (বর্মা) দেশসমূহে প্রায় সব মাঙ্গলিক উৎসবে এমন কি রাষ্ট্রীয় সমারোহগুলোতে জয়মঙ্গল-অট্ঠগাথার আবৃত্তি করার এক উন্নতমানের সাংস্কৃতিক পরম্পরা রয়েছে। বিশেষত শ্রীলংকায় একে রাষ্ট্রীয় গীতরূপে মান্যতা প্রদান করা হয়েছে। অতীত ভারতবর্ষের বৌদ্ধদের মধ্যেও হয়ত এমন পরম্পরার প্রচলন ছিল। তবে সুদীর্ঘ প্রায় দেড় হাজার বছরের অধিককাল ভারত বৌদ্ধশূন্য থাকায় আমরা ঐ ঐতিহ্যময় পরম্পরা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি। ঐ লোকহিতকারী পরম্পরার পুনরুত্থানের আবশ্যকতা রয়েছে।

এ সূত্রের নাম জয়মঙ্গল-অট্ঠগাথা, তবে আটটি গাথার স্থলে এতে রয়েছে নয়টি। প্রতিটি গাথা চতুষ্পদী। প্রতিটি গাথা ছন্দবদ্ধ। এ গাথায় প্রযুক্ত ছন্দের নাম বসন্ততিলক। বা বসন্ততিলকা। এর পরিচয় কিসে হয়? যে গাথার প্রতিটি পাদে বা চরণে সর্বমোট চৌদ্দটি অক্ষর ত-গণ, ভ-গণ, জ-গণ, জ-গণ, দুটি দীর্ঘ মাত্রা আকারে বর্গীকৃত হয়ে সাজানো থাকে তার ছন্দের নাম বসন্ততিলক।

বুত্তোদয় নামক পালি ছন্দের অলংকার-শাস্ত্রে এর পরিচয় এভাবে চর্চিত হয়েছে।

মাত্রা ও গণ ভেদে জয়মঙ্গল-অট্ঠগাথার প্রথম গাথার প্রথম পাদের অক্ষরগুলো বর্গীকৃত হলে এরকম হয়---

বা হা স	হ স্‌স ম	ভি নি ম্মি	ত সা য়ু	ধ ন্তং
– – ᴗ,	– ᴗ ᴗ,	ᴗ – ᴗ,	ᴗ – ᴗ,	ᴗ ᴗ
ত - গণ	ভ - গণ	জ - গণ	জ - গণ	দীর্ঘ দীর্ঘ

এভাবে এ সূত্রের শেষ গাথাগুলোর প্রতিটি পাদের অক্ষর অলংকরণের জ্ঞান অর্জন করা উচিত।

স্বচ্ছ আয়নাকে সূর্য বা চন্দ্রের দিকে হেলিয়ে স্থির রাখা হলে ওতে যেমন সূর্য বা চন্দ্রকে দেখা যায়, তাদের আলো ওতে প্রতিফলিত হয় এবং তা দিয়ে যেমন নিজেকে আলোকিত করা যায় ঠিক তেমনি ভাবে পাঠক বা শ্রোতারাও যদি নিজেদের মনকে নির্মল করে শ্রদ্ধা সহকারে এমন সত্যের প্রতীক মহাকারুণিক তথাগত বুদ্ধের জীবনে ঘটিত সবচেয়ে আশ্চর্যের আটটি ঘটনার স্মারক জয়মঙ্গল-অট্ঠগাথার পাঠ করেন বা শোনেন তাহলে বাচক বা শ্রাবক উভয়েই সত্যের রহস্যময় আন্তর শক্তির আভাস পাবেন। এতে সত্যক্রিয়ার সুপরিণাম ফলীভূত হয়। এভাবে শাস্তা সুগত তাঁর মহাপরিনির্বাণের পর সশরীরে বিরাজমান না থাকলেও তিনি তাঁর সত্যাশ্রিত ধর্মের মাধ্যমে সব সময়ই ধার্মিকদের অন্তরে রয়েছেন। তাই কথিত হয় **'ধম্মো রক্খতি ধম্মিকং'** অর্থাৎ ধর্ম ধার্মিককে রক্ষা করে।

"নমো তস্স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স"

জয়মঙ্গল-অট্ঠগাথা

১। বাহুং সহস্সমভিনিম্মিতং সায়ুধন্তং,
গিরিমেখলং[১]-উদিত-ঘোর-সসেন-মারং।
দানাদি ধম্ম-বিধিনা জিতবা মুনিন্দো,
তন্তেজসা[২] ভবতু তে[৩] জয়মঙ্গলানি।।

২। মারাতিরেকমভিযুজ্ঝিত সব্বরত্তিং,
ঘোরম্পনালবক-মক্খ-মথদ্ধ-যক্খং।
খন্তি-সুদন্ত-বিধিনা জিতবা মুনিন্দো,
তন্তেজসা ভবতু তে জয়মঙ্গলানি।।

৩। নালাগিরিং গজবরং অতিমত্তভূতং,
দাবগ্গি-চক্কমসনীব সুদারুণন্তং।
মেত্তম্বুসে-বিধিনা জিতবা মুনিন্দো,
তন্তেজসা ভবতু তে জয়মঙ্গলানি।।

৪। উক্খিত্ত-খগ্গমতি হত্থ-সুদারুণন্তং,
ধাবন্তি যোজন-পথঙ্গুলিমালবন্তং।
ইদ্ধিভি[৪]-সংখতমনো জিতবা মুনিন্দো,
তন্তেজসা ভবতু তে জয়মঙ্গলানি।।

---

[১]। কোথাও 'গিরিমেখলা'

[২]। কোথাও 'তং তেজসা'

[৩]। নিজের 'জয় ও মঙ্গল হেতু পাঠ করা হলে 'তে'র স্থলে মে' পাঠ করতে হবে।

[৪]। কোথায়ও ইদ্ধীভি শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়।

৫। কত্বান কট্ঠমুদরং ইব গব্বিভনীয়া,
চিঞ্চায় দুট্ঠবচনং জনকায়মজ্ঝে।
সন্তেন সোমবিধিনা জিতবা মুনিন্দো,
তন্তেজসা ভবতু তে জয়মঙ্গলানি।

৬। সচ্চং বিহায়মতি-সচ্চক-বাদকেতুং,
বাদাভিরোপিতমনং অতি-অন্ধভূতং।
পঞ্ঞাপদীপজলিতো[৫] জিতবা মুনিন্দো,
তন্তেজসা ভবতু তে জয়মঙ্গলানি।।

৭। নন্দোপনন্দ-ভূজগং বিবিধং[৬] মহিদ্ধিং,
পুত্তেন থের-মুদগেন[৭] দমাপয়ন্তো।
ইদ্ধূপদেস-বিধিনা[৮] জিতবা মুনিন্দো,
তন্তেজসা ভবতু তে জয়মঙ্গলানি।।

৮। দুগ্গাহদিট্ঠি ভুজগেন সুদট্ঠহত্থং,
ব্রহ্মং বিসুদ্ধি[৯] জুতিমিদ্ধি বকাভিধানং।
ঞাণাগদেন বিধিনা জিতবা মুনিন্দো,
তন্তেজসা ভবতু তে জয়মঙ্গলানি।।

৯। এতাপি বুদ্ধ-জয়মঙ্গল-অট্ঠগাথা,
যো বাচকো দিনে দিনে সরতেমতন্দি।
হিত্বানেক বিবিধানি চুপদ্দবানি,
মোক্খং সুখং অধিগমেয্য নরো সপঞ্ঞো।।

৫। কোথাও 'পঞ্ঞাপদীপজ্জলিতো' -এর প্রয়োগ দেখা যায়।
৬। কোথাও 'বিবুধং' শব্দের প্রয়োগ হয়েছে।
৭। কোথাও 'ভূজগেন' শব্দের প্রয়োগ করা হয়।
৮। কোথাও 'ইদ্ধোপদেস বিধিনা' প্রযুক্ত হতে দেখা যায়।
৯। কোথাও 'বিসুদ্ধিং' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়।

জয়মঙ্গল-অট্‌ঠগাথা

১। বাহুং[১০] সহস্‌সমভিনিম্মিতং সায়ুধন্তং,
গিরিমেখল[১১]-উদিত-ঘোর-সসেন-মারং।
দানাদি ধম্ম-বিধিনা জিতবা মুনিন্দো,
তন্তেজসা[১২] ভবতু তে[১৩] জয়মঙ্গলানি।।

শব্দার্থ :

বাহুং	-	বাহু (ভূজা, হাত)
সহস্‌সং	-	হাজার (সহস্র)
অভিনিম্মিতং	-	বিশেষভাবে নির্মিত
স-আয়ুধন্তং	-	অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত
গিরিমেখলং	-	গিরিমেখলা (নামক হাতি)
উদিত	-	উদিত হয়ে
ঘোর	-	ভয়ানক
সসেন	-	সসৈন্য (সবল বাহিনী)
মারং		
দানাদি	-	দান আদি (পারমিতা)
ধম্ম	-	ধর্ম

---

[১০]। কোথাও 'বাহা'

[১১]। কোথাও 'গিরিমেখলা'

[১২]। কোথাও 'তং তেজসা'

[১৩]। নিজের 'জয় ও মঙ্গল হেতু পাঠ করা হলে 'তে'র স্থলে মে' পাঠ করতে হবে।

বিধিনা	-	বিধিতে
জিতবা	-	জয়ী (বিজয়ী হয়েছিলেন)
মুনিন্দো	-	মুনীন্দ্র (বুদ্ধ)
তং	-	ঐ
তেজসা	-	তেজশক্তির প্রভাবে
ভবতু	-	(সাধিত) হউক
তে	-	তোমার (বা আপনার) তাদের
জয়মঙ্গলানি	-	জয় ও মঙ্গল

ভাবার্থ : গজশ্রেষ্ঠ গিরিমেখলার পিঠে আরোহী ও অভিনির্মিত সহস্র বাহুতে অস্ত্রধারী সসৈন্য মারকে মুনীন্দ্র বুদ্ধ যে দানাদি পারমিতা ধর্মের প্রভাবে জয় করেছিলেন, তাঁর ধর্মের (সত্যের) তেজ-প্রভাবে আপনার জয় ও মঙ্গল সাধিত হউক।

পৃষ্ঠভূমি : বৈশাখী পূর্ণিমা তিথির সূর্যাস্তের পরদিন সূর্যোদয়ের মধ্যবর্তী ত্রিযামকালে উরুবেলার নৈরঞ্জনা নদীর তীরবর্তী বোধিবৃক্ষ-তলে বোধিসত্ত্ব সিদ্ধার্থ মারকে পরাজিত করে বুদ্ধত্ব প্রাপ্তিকে কেন্দ্র করে এই গাথা তৈরী।[১৪]

বোধিবৃক্ষতলে বজ্রাসনে পূর্বাভিমুখী হয়ে বজ্রকঠিন সংকল্প নিয়ে বোধিসত্ত্ব তাপস সিদ্ধার্থকে ত্যাগ ও তিতিক্ষার তপে লীন দেখে (দেবপুত্র-) মারের টনক নড়ে। পরোক্ষে সামান্য বাধাবিঘ্ন ও ভয় সৃষ্টি, এমন কি প্রলোভন দেবার সব প্রয়াস ব্যর্থ গেল তা দেখে মার

[১৪]। জাতকট্ঠকথার নিদানকথার ভিত্তিতে প্রস্তুত এটি।

এবার তাঁর সহস্রবাহু নির্মাণ করেন। এতেই ক্ষান্ত হন নি তিনি। সশরীরে ও সসৈন্য মার আবির্ভূত হন। তাপস সিদ্ধার্থের কোমল হৃদয়ে ভয় সৃষ্টির করার উদ্দেশ্যে তিনি গজরাজ গিরি-মেখলাকেও অস্ত্ররূপে প্রয়োগ করেন। শাস্ত্র-মতে ঐ গজরাজের উচ্চতা ছিল এক শত পঞ্চাশ যোজন। এ হতেই তার ভীমকায়ের অনুমান সহজে করা যেতে পারে। ঐ গজরাজের পিঠে চড়ে মার চলমান পর্বত-প্রমাণ হয়ে বিভীষিকাময় একাধিক ভয়ানক রূপ ধারণ করে বোধিবৃক্ষের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। ঐ গজরাজ বৃংহতি নাদে গর্জন চলেছিল। কখন কখন গজরাজের গর্জনের মাত্রা তুঙ্গে উঠে হতো মেঘগর্জনের সমান। সৈন্যসমূহের সংখ্যা ছিল অসংখ্য। বোধিসত্ত্ব তাপস সিদ্ধার্থের সামনে ও পেছনে সৈন্যের পরিমাণ ছিল বার যোজন করে। আর ঐরূপ দক্ষিণে ও বামে সৈন্যের পরিমাণ ছিল নয় যোজন করে। মার নিজের শক্তিতে নির্মিত হাজার বাহুতে বিদ্যুতের ন্যায় চমকপ্রদ হাজার অস্ত্র ধারণ করেন। মারের সৈন্য-বাহিনীতে অদৃশ্য সেনাও ছিল দশ প্রকারের। যেমন- (১) লোভ, (২) দ্বেষ, (৩) ক্ষুধা ও পিপাসা, (৪) তৃষ্ণা, (৫) কুশল কর্মে অনীহা (স্ত্যান-মিদ্ধ), (৬) ভয়, (৭) শংকা, (৮) প্রবঞ্চনা, (৯) স্বার্থ বশে লাভ (লাভ-সৎকার) আর (১০) আত্ম-প্রশংসা ও পরনিন্দা। এসব ছাড়া ছিল মারকন্যারা মার-কন্যাদের নাম-তৃষ্ণা, অরতি ও রগ (রাগ)। মারকন্যাদেরও ছিল নিজস্ব সেনা-বাহিনী। পিতার অভিযানে মার-কন্যারাও নানা ভূমিকা পালন করেন। মার তাঁর সুসজ্জিত বল-বাহিনীকে তাপস সিদ্ধার্থের বিরুদ্ধে এগিয়ে যাবার নির্দেশ দেন।

মারের উপরোক্ত দশ প্রকারের বিশেষ সেনার প্রত্যেকটিকে বোধিসত্ত্ব তাপস সিদ্ধার্থ তাঁর এক একটি পারমিতা গুণ স্মরণ করে দমন করেন। দশ পারমিতা ছিল দান, শীল, ক্ষান্তি, বীর্য, ধ্যান। এসবের

মাধ্যমেও তাপস সিদ্ধার্থকে টলাতে না পেরে, সব শেষে মার তার শেষ অস্ত্র তাপস সিদ্ধার্থের দিকে ছুঁড়ে মারেন। এ অস্ত্রের নাম চক্রায়ুধ। প্রলয়ঙ্করী তাণ্ডবলীলা করে ঐ চক্রায়ুধ। তাপস সিদ্ধার্থের মাথার উপরে এসে সোনালি চাঁদোয়ার মত ঘিরে রাখে। মারের অস্ত্র না হয়ে তা যেন ভাবী বুদ্ধের বিজয় কেতন ছিল।

নিজের পরাজয় না মেনে মার এবার বজ্রাসনে বসার অধিকার দাবী করে বলেন- 'তাপস, এ আসন ছেড়ে চলে যাও। এ আসন আমার, তোমার নয়।' ভাবী বুদ্ধ বলেন-- 'এ আসন কেবল মাত্র আমার যোগ্য।' এ ত্রিলোকে আমি ছাড়া আর কারও এ আসনে বসার অধিকার নেই। এ আসনের যোগ্য উত্তরাধিকারী হবার জন্যে অসংখ্য কল্পকাল ধরে বুদ্ধকারক পারমিতা 'ধর্ম পূর্তির অভ্যাস নিরন্তর করে আসছি।' আগে পিছে কিছু না ভেবে মার তৎক্ষণাৎ বলে ফেলেন- 'আরে, তেমন পারমিতা পূর্তি তো আমিও অনেক করেছি।' ভাবী বুদ্ধ জানতে চান- 'তার সাক্ষী কোথায়?' মার তার অপার বল-বাহিনী, এমন কি যক্ষ-রক্ষ, দেব-দানব, কিন্নর-কিন্নরী গণকে মিথ্যে সাক্ষ্যদানের সংকেত দেন। সংকেত পেতেই দণ্ডভয়ে ভীত তারা সবাই হৈ হৈ রৈ রৈ করে মারের সমর্থনে বলে ফেলেন-- 'হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা সাক্ষী আছি।' মার এবার হুংকার দিয়ে তাপস সিদ্ধার্থকে বলেন-- 'হে তাপস, তোমার সাক্ষী কোথায়?'

তাপস সিদ্ধার্থ ভাবেন-- 'এমন একজন সচেতন প্রাণীকেও দেখছি না যে আমাকে এ মূহুর্তে আমার সাক্ষী হয়ে সমর্থন দেবে। জন্মে জন্মান্তরে অসংখ্য কল্পকাল ধরে দশ প্রকারের পারমিতা পূর্তির যে নিরন্তর প্রয়াস করেছি তার সাক্ষী দেবার জন্যে সচেতন প্রাণী সমূহের মধ্যে কেহই নেই। আমি যার-পর-নেই যে প্রয়াস চালিয়েছি তা মিথ্যে নয়। তা অকাট্য সত্য। সচেতন প্রাণীরা নিজ নিজ সংকীর্ণ স্বার্থপরতার কারণে

মোহান্ধ হয়ে সত্যকে মিথ্যা আর মিথ্যাকে সত্য বলে সাক্ষী দিয়েছে। সংকীর্ণ স্বার্থপরতার ঊর্ধ্বে কে বা কি এমন আছে যে বা যা নির্ভয়ে ও নিষ্পক্ষভাবে আমার সত্য ঘটনার সাক্ষী হবে। তা খুঁজে দেখেন। স্বার্থ না থাকায় নেই এই ধরিত্রীর কোন ভয় নেই। তিনি ভেবে দেখেন, এই ধরিত্রী নিশ্চয়ই নিরপেক্ষ ভাবে আমার এই সত্য ঘটনার সাক্ষ্যদান করবেন। কারণ পারমিতা পূর্তির উদ্দেশ্যে যা কিছু করেছি তার সবই করেছি এই ধরিত্রীকে ভিত্তি করে।' এভাবে ভেবে-চিন্তে তাপস সিদ্ধার্থ সত্যক্রিয়া করেন-- 'এ বজ্রাসনে বসে বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে কৃত পারমিতা পূর্তির ঘটনা যদি সত্য হয়ে থাকে তবে এ ধরিত্রী যেন মূক না থেকে আমার সাক্ষী হন।' এ সত্যক্রিয়ার প্রতীকরূপে ভাবী বুদ্ধ ডান হাতের মধ্য অঙ্গুলি দিয়ে ধরিত্রী ভূমিকে স্পর্শ করেন। দীর্ঘকাল অসহনীয় অত্যাচার সহনের পর বোধিসত্ত্বের হাতের স্পর্শ পেতেই ভূগর্ভের ভিতর থেকে অস্ফুট ধ্বনি ফুটে উঠে। সসাগরা পৃথিবী ঘন ঘোর গর্জন করে কয়েকবার প্রকম্পিত হয়। এ যেন ছিল মারের হুংকারের প্রত্যুত্তরে ধরিত্রীর মহাহুংকার। আকাশ-পাতাল ধরিত্রী এক স্বরে বলে উঠে-- 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাপস সিদ্ধার্থ এই বজ্রাসনে বসে বুদ্ধত্ব (সর্বজ্ঞতা) প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে কয়েক কল্পকাল যাবৎ বিভিন্ন জন্ম নিয়ে পারমিতা পূর্তি করেছেন। আমি তার সাক্ষী। এ ত্রিভবে একমাত্র তাপস সিদ্ধার্থই এ অচল বজ্রাসনে বসার যোগ্য অধিকারী।'

পৃথিবীর ঐ প্রকম্পন যেমন তেমন সাধারণ প্রকম্পন ছিল না। তা ছিল এক অসাধারণ প্রলয়ঙ্কারী কাণ্ড। এর চপেটাঘাত সইতে না পেরে মার তার অসংখ্য বল-বাহিনী দিশাহীন হয়ে পরাজয় স্বীকার করেন। কে কোন দিকে পালিয়ে প্রাণ বাচায় তার হিড়িক পড়ে। তাদের রণভূমি ত্যাগের পালা শুরু হতেই মারের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করেছিল এমন

অনেক যক্ষ-রক্ষ, দেব-দানব, কিন্নর-কিন্নরী পূর্বের চেয়ে অধিকতর উঁচু স্বরে বলে উঠে-- 'মার পালিয়েছে। মারের পরাজয় হয়েছে। জয় হল তাপস সিদ্ধার্থের। জীব-জগতের রহস্যভেদ করে তিনি বুদ্ধ হয়েছেন। জয়, বুদ্ধের জয়; জয়, বুদ্ধের জয়; জয় বুদ্ধের জয়।'

[এভাবে দশ (অন্যভাবে ত্রিশ) প্রকার পারমিতা-পূর্তি জনিত সত্য-ক্রিয়ার প্রভাবে বোধিসত্ত্ব তাপস সিদ্ধার্থ মারমর্দন করে বুদ্ধ হয়েছিলেন। জয়-মঙ্গল-অষ্টগাথায় প্রথমটির বাচন ও শ্রবণ কালে বাচক ও শ্রোতা উভয়ে যদি মারমর্দনের পুরো ঘটনা ভাল ভাবে স্মরণ করেন। যদি শ্রদ্ধা ও একাগ্রতার সাথে তাঁরা সত্যক্রিয়া করেন তবে তার প্রভাবে বাচক ও শ্রোতা উভয়ের জীবনে জয় ও মঙ্গল অবশ্যই সাধিত হবে। প্রথমত বুদ্ধগণ কখনও মিথ্যে কথা বলেন না। সব সময় সত্য কথা বলেন। বুদ্ধগণ সত্যের পূজারী হন। তাঁরা সত্যের মূর্ত প্রতীক। তাঁরা সত্যের প্রতিমূর্তি। এই সত্যের শক্তিতে তাঁরা এ সংসারে অতুলনীয় ও অপ্রতিদ্বন্দী। তাঁদের এই অনুপম ও অকাট্য সত্যের বল কোন দেশ বা কালের সীমায় বাধিত বা খণ্ডিত হয় না। প্রয়োগে এটি ক্ষীণ হয় না। প্রয়োগে এর ক্ষয় হয় না। বরং যত বারই এর প্রয়োগ করা হউক না কেন তার শক্তি বাড়ে, তত বারই তা পূর্বাপেক্ষা অধিক আশু সুফল প্রদান করে। বহুজনহিতে বহুজনসুখে বোধিসত্ত্বগণ কর্তৃক তা আচরিত হয়। বহুজনহিতে ও বহুজনসুখে বুদ্ধগণ কর্তৃক তা আবিস্কৃত হয়। যতদিন তা আচরিত হয় বা তাকে স্মরণ করা হয় ততদিন তার অস্তিত্ব ও সুফল দৃশ্যমান থাকে। আর তা করা না হলে সত্য সাধারণ মানুষের চোখে অদৃশ্য থাকে ও লুপ্তপ্রায় হয়।]

২। মারাতিরেকমভিযুজ্ঝিত সব্বরত্তিং,
ঘোরম্পনালবক-মক্খ-মথদ্ধ-যক্খং।
খন্তি-সুদন্ত-বিধিনা জিতবা মুনিন্দো,
তন্তেজসা ভবতু তে জয়মঙ্গলানি।।

শব্দার্থ :

মারং	-	মারকে
অতিরেকং	-	অতিরিক্ত
অভিযুজ্ঝিত	-	যুদ্ধে অভিমুখীন
সব্বরত্তিং	-	সারা রাত
ঘোরম্পন (ঘোরং পন)	-	ঘোর (ভয়ানক)
আলবক	-	আলবক
মক্খং	-	মৃক্ষ্য (ঈর্ষান্বিত)
থদ্ধং	-	স্থির (দৃঢ়)
যক্খং	-	যক্ষকে
খন্তি	-	ক্ষান্তি (সহিষ্ণুতা)
সুদন্ত	-	সুসংযমতা (দমগুণে সম্পন্ন)
বিধিনা	-	বিধির দ্বারা
জিতবা	-	জয়ী, বিজয়ী (হয়েছিলেন)
মুনিন্দো	-	মুনীন্দ্র বুদ্ধ; মুনিদের ভিতর শ্রেষ্ঠ।

ভাবার্থ : সারা রাত রণে রত ঘোর, দুর্ধর্ষ ও পাষাণ হৃদয় সম্পন্ন মার হতেও অধিকতর ঈর্ষা-পরায়ণ ও অভিমানী আলবক যক্ষকে মুনীন্দ্র বুদ্ধ যে ক্ষান্তি পারমিতার (বলে) গুণে জয় করেছিলেন, ঐ ধর্মের (সত্যক্রিয়ার) প্রভাবে আপনার জয় ও মঙ্গল সাধিত হউক।

পৃষ্ঠভূমি : সূত্রের প্রথম গাথায় বর্ণিত মার অপেক্ষাও ভয়ানক নির্দয়ী ও অতি ঈর্ষাপরায়ণ আলবক যক্ষের দমন-কথা এই দ্বিতীয় গাথার কথাবস্তু[১৫]।

বুদ্ধকালীন কোশল জনপদের রাজধানী শ্রাবস্তী ও কাশী জনপদের রাজধানী বারাণসী, আর শ্রাবস্তী ও মগধের রাজধানী রাজগৃহের মধ্যবর্তী এক জনপদের নাম ছিল আলবী। এর রাজার নাম আলবক। রাজার পুত্রের নাম ছিল আলবক-কুমার। পরবর্তীকালে আলবক যক্ষের নিবাসস্থান রূপেও ঐ জনপদটি পালি সাহিত্যে অতি চর্চিত হয়।

আলবক যক্ষের দাপট ছিল প্রচণ্ড। ঐ আলবক যক্ষ যক্ষরাজের কাছ হতে প্রতিদিন একটি প্রাণী বলি রূপে পাবার বর প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এ বর অনুসারে আলবক যক্ষের বাসভবনের নিকটবর্তী অশ্বত্থবৃক্ষের ছায়ায় যে কেহ আসবে তাকে আলবক যক্ষ খেতে পারবে।

একদিন শিকারের অন্বেষণে আলবীর রাজা নিজেই ভুলক্রমে ঐ স্থানে এসে পৌঁছোন। আলবক যক্ষ আলবীর ঐ রাজাকে আটকে রাখেন। শেষে রাজা আলবক আলবক-যক্ষের বলি রূপে প্রতিদিন একজন নাগরিককে পাঠানোর শর্তে রাজী হওয়ায় যক্ষের হাত হতে ছাড় পান। শেষে ঐ নগরীর নগরগুপ্তিক ও মন্ত্রীদের মধ্যস্থতায় নগরের দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীদের এক একজনকে এক নির্ধারিত দিনের অন্তরালে তাঁর

১৫। 'সুত্তনিপাতের আলবকসুত্ত' ও তার অট্ঠকথার ভিত্তিতে এই ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

কাছে পাঠানোর শর্তে আলবক যক্ষ সম্মতি প্রদান করেন। এ শর্ত অনুসারে কিছুকাল অপরাধীদের পাঠানো হয়। শেষে এমন এক সময় আসে যখন ঐ জনপদে আর কোন অপরাধী বেঁচে ছিল না। শেষে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় প্রত্যেক গর্ভবতী নারী তার সন্তানকে আলবক যক্ষের বলিরূপে পাঠাবে। এ সিদ্ধান্তের কথা শুনে ভীতা ত্রস্তা গর্ভবতীরা একে একে চুপে চুপে অন্য রাজ্যে চলে যায়। এতে সংকট বিকট হয়ে দাঁড়ায়। রাজার দুশ্চিন্তা আরও বেড়ে যায়। শর্ত লঙ্ঘনের দণ্ডে রাজা নিজে আলবকযক্ষের দণ্ডাধীন হবার ভয়ে ভীত-ত্রস্ত হয়ে পড়েন। আর গত্যন্তর না দেখে রাজা মন্ত্রীদের পরিষদকে আদেশ দেন আগামীকাল রাজকুমারকে মর্যাদার অনুকূল বস্ত্রাভূষণে অলংকৃত করে আলবক যক্ষের কাছে নিয়ে যাবার। আদেশ অনুসারে সব প্রস্তুতি নেওয়া হয়।

ভগবান বুদ্ধ তাঁর ষোড়শতম বর্ষাবাস যাপনকালে প্রতিদিনকার নিয়ম-মতো 'অতি আসন্ন সংকটে আজ কার কিভাবে উপকার করতে পারবেন' জানার জন্যে ধ্যানস্থ হন আর দিব্যদৃষ্টির প্রসার করেন। আলবকযক্ষের বলিরূপে আলবক-কুমারকে প্রেরণের প্রস্তুতি ও এর দুষ্পরিণামে আলবক-রাজার যার-পর-নাই দুশ্চিন্তার কথাও শাস্তা সুগত জানতে পারেন। সংকট অতি গম্ভীর আর সুদুরগামী দেখে ভগবান বুদ্ধ মহাকরুণাবশত আলবক-কুমারের প্রাণরক্ষার্থে ঐ দিন সন্ধ্যায় শ্রাবস্তী হতে ত্রিশ যোজন দুরে অবস্থিত আলবক যক্ষের বিশাল যক্ষভবনে যান।

ঐ সময় আলবক যক্ষ হিমবন্ত প্রদেশে আয়োজিত এক যক্ষ-সভায় যোগদান করতে গিয়েছিলেন। আলবক যক্ষের ভবনের দুয়ার-রক্ষীর কাছে যক্ষ-ভবনে কিছুকাল বিশ্রাম নেবার অনুমতি চাইলে দ্বাররক্ষী গর্দভ অনুমতি না দিয়ে পারেন নি, তবে তার প্রভু আলবক যক্ষের চণ্ড-

স্বভাবের কথা শুনিয়ে শাস্তাকে সতর্ক করে দেন। ভগবান বুদ্ধ অনুমতি পেয়ে যক্ষ-ভবনের যক্ষ-আসনে আসীন হন। যক্ষ-আসনে আসীন হয়ে তিনি আলবক যক্ষের রক্ষিতা নারীদের উপদেশ দিচ্ছিলেন।

অন্যদিকে ঐ দ্বাররক্ষী আলবক যক্ষের কাছে গিয়ে যক্ষ-আসনে আসীন বুদ্ধের কথা জানান। ঠিক ঐ সময়েই সাতগির ও হেমবন্ত নামে দুই যক্ষও ঐ যক্ষ-সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন। তারাও আলবক যক্ষের কাছে গিয়ে তাদের অভিজ্ঞতার কথা জানান। তারা বলেন আপনার বাসভবনের উপর দিয়ে এখানে আসার পথে আকাশ-মার্গে বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন তারা। বাসভবনের উপর দিয়ে যেতে না পেরে তার কারণ জানার উদ্দেশ্যে নীচে নামেন। যক্ষ-ভবনে প্রবেশ করলে তারা শাস্তা সুগতকে ধর্মদেশনারত অবস্থায় দেখতে পান।

তিন জনের মুখে বুদ্ধের প্রশংসা শুনতেই আলবক যক্ষ তেলে-বেগুনে চটে যায়। রাগে থাকতে না পেরে ঐ যক্ষ-সভা হতেই উঁচু স্বরে "শ্রমণ গৌতম, শ্রমণ গৌতম" বলে চেঁচাতে থাকেন। সেখান থেকেই আলবক যক্ষ বুদ্ধকে আসন-চ্যুত করার প্রয়াস করতে থাকেন। এ প্রয়াসে আলবকযক্ষ তার আসুরিক শক্তিকেও কাজে লাগায়। তার ঐ আসুরিক শক্তিও নিষ্ফল হওয়ায় সে আরও চটে যায়। তাড়াহুড়ো করে আসার প্রক্রিয়ায় আলবক যক্ষ তার বাম পা মনোশিলাতলে আর ডান পা কৈলাশ পর্বতের মাথায় রাখেন। তার হুংকার সারা জম্বুদ্বীপে শোনা যাচ্ছিল। বাসভবনের বাইরে দাঁড়িয়ে আলবক যক্ষ তার আয়ত্তাধীন সব ঋদ্ধি শক্তিগুলির পুন প্রয়োগ করেন।

তা সত্ত্বেও বুদ্ধকে অপ্রভাবিত দেখে আলবক যক্ষ তার শেষ অস্ত্র 'দুস্সায়ুধ' -এর প্রয়োগ করেন। তার এ দুস্সায়ূধ আকারে ও শক্তিতে ইন্দ্রের বজ্রায়ুধ, বৈশ্রবণের গদায়ুধ, ও যমের নয়নায়ুধের তুল্য ছিল। ঐ

দুস্সায়ুধ আকাশে ছোঁড়া হলে বারটি বছর ক্রমান্বয়ে বৃষ্টি হত না, পৃথিবীতে ছোঁড়া হলে বার বছর গাছপালা শুকিয়ে যেত, সমুদ্রে ছোঁড়া হলে সমুদ্রের জলও শুকিয়ে যেত, এমন কি সুমেরু পর্বতকেও টুকরো টুকরো করে দেবার সামর্থ্য রাখতো তা। এই দুস্সায়ুধ বস্ত্রে নির্মিত হওয়ায় একে এ কারণে বস্ত্রায়ুধও বলা হয়। আলবক যক্ষ এটিকে উত্তরাসঙ্গের ন্যায় ব্যবহার করতেন। এমন দুস্সায়ুধও বুদ্ধের প্রভাবে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। শেষে আলবকযক্ষ নিজের বাসভবনের বাইরে দাঁড়িয়ে বুদ্ধকে বাসভবনের বাইরে আসার জন্যে বলেন।

যক্ষ - শ্রমণ, বাইরে বেরিয়ে পড়।

বুদ্ধ - 'বেশ, আয়ুষ্মান।' এ কথা বলে ভগবান বুদ্ধ নম্রতার সাথে বাসভবনের বাইরে বেরিয়ে আসেন।

যক্ষ - শ্রমণ, ভেতরে যাও।

বুদ্ধ - 'বেশ, আয়ুষ্মান।' একথা বলে ভগবান বুদ্ধ নম্রতার সাথে ভেতরে প্রবেশ করেন।

যক্ষ - (দ্বিতীয়বার) শ্রমণ বাইরে বেরিয়ে পড়।

বুদ্ধ - 'বেশ, আয়ুষ্মান।' একথা বলে ভগবান বুদ্ধ দ্বিতীয় বারও বিনম্রতার সাথে বাইরে বেরিয়ে আসেন।

যক্ষ - (তৃতীয়বার) শ্রমণ, বাইরে বেরিয়ে পড়।

বুদ্ধ - বেশ, আয়ুষ্মান। একথা বলে ভগবান বুদ্ধ বিনম্রতার সাথে বাইরে বেরিয়ে আসেন।

যক্ষ - (চতুর্থবার) শ্রমণ, বাইরে বেরিয়ে পড়।

বুদ্ধ - আয়ুষ্মান, আর আমি তোমার নিকট যাব না। তোমার যা ইচ্ছে

তা কর।

যক্ষ - তোমাকে কয়েকটি প্রশ্ন করব। প্রশ্নের উত্তর যদি সঠিক হয় তবে তো রক্ষা। তা না হলে তোমার মতিভ্রম করবো। অথবা তোমার হৃদয় বিদীর্ণ করবো। আর না হয় তোমার পা দুটো বেঁধে গঙ্গার ওপারে ছুঁড়ে ফেলবো।

বুদ্ধ - আয়ুষ্মান, দেব-ব্রহ্ম-মার-লোকে, মানব-লোকে, শ্রমণ-ব্রাহ্মণকুলে এমন কাউকে দেখতে পারছি না যে আমার মতিভ্রম ঘটাতে সক্ষম হবে, বা আমার হৃদয় বিদীর্ণ করতে সক্ষম হবে, বা আমার দু'পা বেঁধে গঙ্গার অপর পারে ছুঁড়ে ফেলতে পারবে। তা সত্ত্বেও তোমার যা ইচ্ছে হয় জিজ্ঞেস কর।

যক্ষ - (১) এ জগতে পুরুষের (ব্যক্তির) শ্রেষ্ঠ ধন কি? (২) কি সংরক্ষিত হলে সুখদায়ক হয়? (৩) রসসমূহের মধ্যে সর্বাধিক রসদায়ক কি? (৪) কি ভাবে জীবন-যাপন করলে তা শ্রেষ্ঠ জীবন কথিত হয়?

বুদ্ধ - শ্রদ্ধাই পুরুষের (ব্যক্তির) শ্রেষ্ঠধন। ধর্ম-সুগৃহীত হলে সুখদায়ক হয়। সত্য সর্বাপেক্ষা রসালো বস্তু। প্রজ্ঞাবান পুরুষের জীবন শ্রেষ্ঠ জীবন কথিত হয়।

যক্ষ - (৫) কোন্ উপায়ে বন্যার জল অতিক্রম করা যায়। (৬) কোন্ উপায়ে সাগর উত্তীর্ণ হওয়া যায়? (৭) কোন্ উপায়ে দুঃখ জয় করা যায়? (৮) কোন্ উপায়ে শুঁচিতা লাভ করা যায়?

বুদ্ধ - শ্রদ্ধার মাধ্যমে বন্যার জল অতিক্রম করা যায়। অপ্রমাদের দ্বারা সাগর অতিক্রম করা যায়। বীর্যের দ্বারা দুঃখ জয় করা যায়। প্রজ্ঞার মাধ্যমে শুঁচিতা লাভ করা যায়।

যক্ষ - (৯) কোন্ উপায়ে প্রজ্ঞা লাভ করা যায়? (১০) কোন্ উপায়ে ধন সঞ্চিত হয়? (১১) কোন্ উপায়ে কীর্তি লাভ করা যায়? (১২) কোন্ উপায়ে মিত্র লাভ করা যায়? (১৩) কোন্ উপায়ে পরলোকের দুঃখ লাঘব করা যায়?

বুদ্ধ - নির্বাণগামী শ্রেষ্ঠ মার্গে (ধর্ম) শ্রদ্ধাবান, অপ্রমত্ত ও বিচক্ষণ হয়ে এবং ধর্মশ্রবণে আগ্রহী হয়ে প্রজ্ঞালাভ করা যায়।

প্রতিরূপকারী, ধুরবান ও উদ্যমশীল ব্যক্তি ধন লাভ করেন। সত্য আচরণের মাধ্যমে যশ-কীর্তি লাভ করা যায়। দানশীলতার মাধ্যমে মিত্র লাভ করা যায়।

সত্য, ধর্ম, ধৃতি ও ত্যাগ-- এ চার প্রকার গুণের অধিকারী ব্যক্তি পরলোকের দুঃখ লাভ করেন না।

বুদ্ধ - হে আলবক, অন্য শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণকে জিজ্ঞেস করে দেখ-- এ জগতে সত্য, দম, ত্যাগ আর ক্ষান্তির চেয়ে শ্রেষ্ঠতর আর কোন ধর্ম আছে কি না।?

যক্ষ - অপর শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণকে আর জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন কোথায়?

ভবিষ্যতে যা মঙ্গলদায়ক তা আজ আমার জানা হয়েছে। আমার মঙ্গলের জন্যেই ভগবান বুদ্ধ আলবী এসেছেন। কি ভাবে দান দিলে মহান ফল হয় তা আজ ভালভাবে জানলাম।

এভাবে প্রশ্নোত্তরী ধর্মালাপ চলতে চলতে রাত কেটে ভোর হয়ে যায়।

ধর্মোপদেশ শ্রবণের পর আলবক যক্ষ স্রোতাপন্ন হন। বুদ্ধ প্রদত্ত উত্তরের প্রশংসায় আলবক যক্ষ মহানন্দে ও সকৃতজ্ঞ চিত্তে 'সাধু' বাদ দেন। আর বলেন-- এ হতে আমরণ-কাল বুদ্ধের ও ধর্মের পরি-

পূর্ণতার (প্রচার-প্রসার) জন্যে গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে সানন্দে বিচরণ করব।

ঊষাকালে রাজা আলবকের প্রতিনিধিগণ রাজার একমাত্র পুত্র কুমারকে বলিরূপে আলবক যক্ষের হাতে তুলে দেবার জন্যে নিয়ে যান। বাসভবনের প্রবেশদ্বারেই আলবক যক্ষকে মহানন্দে 'সাধু'বাদ দিতে শুনে রাজপ্রতিনিধিগণ আশ্চর্য-চকিত হন। বুদ্ধের উপস্থিতিতেই তারা রাজকুমারকে আলবকযক্ষের হাতে তুলে দেন। আলবকযক্ষ লজ্জাবোধ করেন। স্রোতাপন্ন হওয়ায় প্রাণের বিনিময়েও প্রাণ-হত্যাজনিত শীল-লঙ্ঘনের মানসিকতা তার অন্তর হতে সমূলে বিনষ্ট হয়। আলবকযক্ষ ঐ রাজকুমারকে মহাকারুণিক তথাগত বুদ্ধের হাতে তুলে দেন। ভগবান বুদ্ধ আশীর্বাদ দেন। ঐ ঘটনার ভিত্তিতে রাজকুমার আলবক 'হত্থক-আলবক'রূপে খ্যাতি প্রাপ্ত হন।

আলবক যক্ষ ভগবান বুদ্ধের অনুগত শিষ্য হয়েছেন শুনে আলবীর রাজা ও প্রজাবৃন্দ আশ্বস্ত ও সন্তুষ্ট হন। কৃতজ্ঞতার অভিব্যক্তিরূপে তারা আলবক যক্ষের জন্যে মহার্ঘ বাস-ভবন তৈরী করিয়ে উপহাররূপে প্রদান করেন।

[দ্বিতীয় গাথার আবৃত্তিকালে এবং আবর্তকদের তা শ্রবণকালে শ্রোতাদের উপরোক্ত ঘটনাক্রম স্মরণ করা ও তার স্মরণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা উৎপন্ন করা উচিত। যে ক্ষান্তি ও সুসংযমতার (পারমিতা) গুণে আলবক যক্ষকে তথাগত বুদ্ধ দমন করেছিলেন, ঐ সত্যের (ধর্মের) অকাট্য ক্ষমতার সম্পর্কে অবহিত থেকে যদি সত্যক্রিয়া করা হয় তবে ঐ সত্যক্রিয়ার সুফলে পাঠক ও শ্রোতা উভয়ে বাধা বিঘ্ন হতে মুক্ত হয়ে সুখী সমৃদ্ধশালী হতে পারবেন।]

৩। নালাগিরিং গজবরং অতিমত্তভূতং,
দাবগ্নি-চক্কমসনীব সুদারুণন্তং।
মেত্তম্বুসেক-বিধিনা জিতবা মুনিন্দো,
তন্তেজসা ভবতু তে জয়মঙ্গলানি।।

শব্দার্থ :

নালাগিরিং	-	নালাগিরি (কে)
গজবরং	-	গজবর (কে)
অতিমত্তভূতং	-	অত্যন্ত মদমত্ত
দাবগ্নি	-	দাবাগ্নি (দাবানল)
চক্কং	-	চক্র
অসনী'ব	-	বিদ্যুৎলতার (বিজুলী) তুল্য
সুদারুণন্তং	-	সুদারুণ
মেত্ত	-	মৈত্রী
অম্বু	-	বারি (জল)
সেক	-	সিঞ্চনাদি
বিধিনা	-	বিধির দ্বারা
জিতবা	-	জয়ী (হয়েছিলেন)
মুনিন্দো	-	মুনীন্দ্র বুদ্ধ; মুনিদের ভিতর শ্রেষ্ঠ

ভাবার্থ : দাবানলচক্র বা বিদ্যুৎ গর্জনের ন্যায় গর্জন রত অত্যন্ত মদমত্ত সুদারুণ (নিষ্ঠুর) (গজশ্রেষ্ঠ) নালাগিরি হাতিকে মুনীন্দ্র (বুদ্ধ)

যে মৈত্রী (পারমিতা) বারিধারা বর্ষণ করে জয় করেছিলেন, ঐ ধর্মের (সত্য) প্রভাবে আপনার জয় ও মঙ্গল সাধিত হউক।

পৃষ্ঠভূমি : এ গাথার কেন্দ্রবিন্দু হল মদমত্ত নালাগিরির ব্যবহারে অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন।[১৬]

নালাগিরি ছিল মগধরাজ অজাতশত্রুর রাজসংরক্ষণ প্রাপ্ত হাতিশালার এক বিশালকায় হাতি। বুদ্ধের অবর্তমানে সঙ্ঘের অদ্বিতীয় ক্ষমতা-সম্পন্ন ব্যক্তি হবার মানসে দেবদত্ত অজাতশত্রুর সাথে চক্রান্ত করে ভগবান বুদ্ধের জীবন হানি করার কয়েকবার অপপ্রয়াস করেন। ঐ সব অপপ্রয়াসে প্রযুক্ত মানুষেরা শেষ পর্যন্ত হয় বুদ্ধের শরণাপন্ন হন, আর না হয় নিজেরাই একে অপরের মৃত্যুর কারণ হয়। এসব দেখে দেবদত্তের ধারণা জন্মে যে হয়ত বুদ্ধের দিব্যশক্তির প্রভাব পশুর জীবনে পড়বে না। এ ধারণার ভিত্তিতে দেবদত্ত এবার পশুশক্তির সহায়তায় বুদ্ধের প্রাণনাশের সিদ্ধান্ত নেন।

পশুদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী শক্তিশালী হল হাতি। মগধরাজের হাতিশালার হাতিদের মধ্যে সবচেয়ে অবিনীত ও চণ্ড-স্বভাবের হাতি ছিল নালাগিরি। এর চণ্ডস্বভাবের মাত্রাকে আরো বাড়িয়ে তোলার উদ্দেশ্যে প্রতিদিন তাকে যে পরিমাণ মাদক দ্রব্য পান করানো হতো তা দ্বিগুণিত করে দেওয়া হয়। এ সব করানো হয় রাজাজ্ঞায়। এই মর্মে এক রাজাজ্ঞাও জারি করানো হয় যে আগামীকাল পূর্বাহ্নে নালাগিরি হাতিকে রাজপথে খোলা ছাড়া হবে। নাগরিকেরা কেউ যেন পথে তাকে ধরার বা বাধা দেওয়ার চেষ্টা না করে।

নির্দেশ মতে বুদ্ধভক্তগণ ভগবান বুদ্ধকে ও তাঁর ভিক্ষু-সংঘকে এ

---

[১৬] । জাতকট্ঠকথার ভিত্তিতে ঘটনার বর্ণনা করা হয়েছে।

ব্যাপারে অবহিত করান। তাঁরা সতর্ক করে এও বলেন-- 'ভগবান আপনার শিষ্য-সংঘকে নিয়ে আগামীকাল ভিক্ষান্ন-সংগ্রহে নগরের রাজপথে বের হবেন না। বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষু-সংঘের জন্যে আগামীকালের অন্ন-পানীয় দ্রব্য বিহারে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।'

ভগবান বুদ্ধ তাদের সতর্ক বাণী উপেক্ষা করে বলেন--- তারা যেন কোন প্রকারের দুশ্চিন্তা না করেন। সান্ত্বনা দিয়ে বলেন-- বুদ্ধগণের কখনই অকাল মৃত্যু হয় না।

পরদিন পূর্বাহ্নে ভিক্ষান্ন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে রাজগৃহের আঠারটি বিহারে অবস্থানরত বিশাল ভিক্ষু-সংঘ সহ ভগবান বুদ্ধ রাজগৃহের জীবক-আম্রবনের পাশ দিয়ে রাজপথ ধরে বেণুবন বিহারের দিকে এগিয়ে চলেন।

অন্যদিকে পূর্বাহ্নে হাতি-শালায় মাহুতের দল মদমত্ত নালাগিরিকে জোর করে অংকুশ দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে উত্তেজিত করে রাজপথে ঠেলে ছেড়ে দেয়। নালাগিরিও নিজেকে খোলা পেয়ে রেগে গর্জন করে শুঁড় বিক্ষিপ্তভাবে এদিক ওদিক হেলিয়ে দুলিয়ে দৌড়ে রাজপথ দিয়ে জীবক-আম্রবনের দিকে এগিয়ে চলে। রাজপথের দু-ধারের দোকান-পাট সব বন্ধ ছিল। মদমত্ত নালাগিরির উন্মত্ততার খবর পেয়ে পথচারীরাও রাজপথে চলা ছেড়ে দেয়। অলিগলি হয়ে তারা নিজ নিজ গন্তব্যস্থলে যেতে আরম্ভ করে। অনেকে প্রাণ বাঁচিয়ে পালিয়ে যায়। যারা রাজাজ্ঞার ব্যাপারে জানেন না এমন পথচারীরাই ওপথ ধরে চলেছিলেন।

একদিকে ঐ মদমত্ত হাতি বুদ্ধ-প্রমুখ ভিক্ষু-সংঘের দিকে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছিল। অন্যদিকে বুদ্ধ তাঁর শান্ত-দান্ত বিশাল শিষ্য-সংঘকে নিয়ে ধীর-মন্থর গতিতে মদমত্ত নালাগিরির দিকে এগিয়ে চলেছিলেন।

আনন্দ রাজ পথ হতে সরে পড়ার বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও ভগবান বুদ্ধ পিছপা হন নি। আনন্দকে আবার সান্ত্বনা দিয়ে বলেন-- 'আনন্দ, বুদ্ধগণের অকাল মৃত্যু হয় না। কাজেই তুমি সরে পড়।' নালাগিরি ও বুদ্ধের মাঝের দুরত্ব যখন একেবারে কমে আসে হঠাৎ আনন্দ শাস্তার নির্দেশ না মেনে বুদ্ধের প্রাণ-রক্ষার্থে নিজের জীবনের মায়া ত্যাগ করে হাতির সামনে এসে পড়েন। আনন্দের প্রাণরক্ষার্থে ঋদ্ধিশক্তির প্রয়োগ করে বুদ্ধকে পুন এগিয়ে যেতে হয়।

এবার বুদ্ধ ও নালাগিরির মাঝে আর কেহ ছিল না। ঠিক এমনি সময় ক্রন্দনরত শিশু-সন্তানকে কোলে নিয়ে এক নারী হন্ত-দন্ত হয়ে বুদ্ধের সম্মুখে হঠাৎ এসে পড়েন। আর ঐ মদমত্ত হাতিকে চোখের সামনে দেখে কি করবে কিছু ভেবে না পেয়ে প্রাণ বাঁচাবার দায়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে। ঐ সময় অবোধ শিশু-সন্তান পড়ে যায় ভগবান বুদ্ধের চরণে।

অন্যদিকে নালাগিরির তীক্ষ্ম দৃষ্টি তখন বুদ্ধের থেকে সরে গিয়ে শিশুর দিকে যায়। শিশুকে আছড়ে হত্যা করার উদ্দেশ্যে যেই নালাগিরি শুঁড় নীচু করেছে ঠিক ঐ সময় বুদ্ধ তাঁর ডান হাত বরদ-মুদ্রায় বাড়িয়ে হাতির মাথা স্পর্শ করে তার প্রতি মহাকরুণা-বশত মহামৈত্রীভাব প্রসার করেন। ভগবান বুদ্ধের মৈত্রী ভরা কোমল হাতের ছোঁয়া পেতেই নালাগিরির তন-মন দুইই এক অদ্ভূত রোমাঞ্চে রোমাঞ্চিত হয়। শুধু তাই নয়, তার হৃদয় পরিপূর্ণ প্রীতিতে প্রমোদিত হয়। তার মন-মস্তিষ্ক হতে মদের নেশা যেন নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। মন হতে চণ্ডস্বভাব হঠাৎ যেন মৈত্রী-করুণা-মুদিতায় পরিবর্তিত হয়। ভীমকায়সম্পন্ন হলেও নালাগিরি যেন এক অবোধ ও সুবিনীত শিশু তুল্য হয়ে পড়ে। এতই সুবিনীত হয়ে পড়ে যে সে কোন মাহুতের নির্দেশ ছাড়াই স্বত-প্রেরিত হয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে। মাথা নুইয়ে

শুঁড় সঙ্কুচিত করে মহাকারুণিক তথাগত বুদ্ধের চরণ স্পর্শ করে। যেন সে তার প্রাণ ভরা প্রণাম নিবেদন করল। তখন তার দুচোখ জুড়ে আনন্দাশ্রু ঝরে পড়ে। আনন্দাশ্রু দান করে নালাগিরি যেন তার অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করল।

সুগত বুদ্ধ হাতির মঙ্গলাকাঙ্খী হয়ে তাকে ধর্মোপদেশ দান করেন।

বুদ্ধের চরণে মদমত্ত চণ্ড নালাগিরিকে এভাবে নতজানু হয়ে বন্দনা করার ঘটনা লোকমুখে রাজগৃহের সর্বত্র দাবানলের ন্যায় ছড়িয়ে পড়ে। যে যেখানে শুনেছে, শোনামাত্রই ছুটে এসেছে সেখানে। এ চমৎকারপূর্ণ ঘটনায় চকিত হয়ে তারা ভাবাবেগ-পূর্ণ হন। ভাবাবেগে হাত, পা, গলা হতে যে যা পেরেছে অলংকার খুলে নালাগিরির দিকে ছুঁড়ে দেয়। এরপর হতে ঐ নালাগিরি ধনপাল (ধনপালক) নামেও সুপরিচিত হয়ে পড়ে।

এরপর শাস্তা সুগত বুদ্ধ সশিষ্য-সংঘ ভিক্ষান্ন সংগ্রহের পর রাজপথ ধরে বেণুবন বিহারে প্রবেশ করেন। যথাবিধি বিশ্রামের পর শাস্তা সেখানে শিষ্যসংঘকে আহ্বান করে ধর্মোপদেশ দান করেন। তাঁর তাৎকালিক দেশনায় আনন্দের অগ্রশ্রাবক হওয়ার কারণ পূর্বজন্মের অনুস্মরণে বলেন ---- 'শুধু যে এ জন্মে আনন্দ আমার প্রাণরক্ষার্থে আত্মত্যাগে অগ্রণী হয়েছে তা নয়, অতীত জন্মেও অনেকবার এর প্রমাণ দিয়েছে।' তখন তিনি চুল্লহংসজাতকের (জাতক সংখ্যা ৫৩৩) কথা বলে শোনান।

নালাগিরির স্বভাবের অপ্রত্যাশিত পরিবর্তনের প্রসঙ্গ-কথা উত্থাপন করে শাস্তা আরও বলেন--- 'নালাগিরি এজন্মে হাতি না হয়ে যদি মানুষ হতো তা হলে তাঁর (বুদ্ধের) উপদেশ শুনে সে আজ অবশ্যই স্রোতাপন্ন হয়ে আর্য-পুদ্গলে পরিণত হতো।'

[তৃতীয় গাথার আবৃত্তি বা শ্রবণ করা কালে ভাণক বা শ্রোতারা উপরোক্ত ঘটনাগুলোর কথা স্মরণ করলে তাদের হৃদয়ে তথাগতের প্রতি অপার শ্রদ্ধার সঞ্চার হবে। তথাগতের পারমিতা- গুণের, বিশেষত মৈত্রী পারমিতা-পূর্তির আশু সুপরিণামের প্রতি আস্থা পূর্বাপেক্ষা সুদৃঢ় হবে। ঐ শ্রদ্ধাপ্লুত চিত্তে তা পাঠ বা শ্রবণ করলে সত্যক্রিয়ার সুপরিণাম শুধু আশানুরূপভাবেই নয়, আশাতীত-ভাবে হাতে নাতে পাবেন। এতে কোন সন্দেহ নেই।]

৪। উক্খিত্ত-খগ্গমতি-হত্থ-সুদারুণন্তং,
ধাবন্তি-যোজন-পথঙ্গুলিমালবন্তং।
ইদ্ধিভি[১৭]-সংখতমনো জিতবা মুনিন্দো,
তুন্তেজসা ভবত তে জয়মঙ্গলানি।।

শব্দার্থ :

উক্খিত্ত	-	উৎক্ষিপ্ত (উঁচিয়ে)
খগ্গং	-	খড়্গ (তরবারি)
অতি হত্থং	-	বিশাল হাত
সুদারুণন্তং	-	সুদারুণ (ভয়ানক)
ধাবং	-	দৌড়ে দৌড়ে; ধাবিত হয়ে
তিযোজন পথ	-	তিন যোজন দীর্ঘ পথ
অঙ্গুলিমালবন্তং	-	আঙ্গুলের মালাধারী
ইদ্ধিভি	-	অতীন্দ্রিয় ঋদ্ধিশক্তি প্রভাবে
সংখতমনো	-	প্রয়োগের মাধ্যমে
জিতবা	-	জয়ী হয়েছিলেন
মুনিন্দো (মুনি+ইন্দো)	-	মুনীন্দ্র বুদ্ধ; মুনিদের ভিতর শ্রেষ্ঠ

ভাবার্থ : উৎক্ষিপ্ত খড়্গ হাতে ভয়ানক ও ত্রিযোজন পথ নিমেষে অতিক্রম (ধাবন) করতে সমর্থ অঙ্গুলীমালকে মুনীন্দ্র বুদ্ধ যে নিজ অলৌকিক ঋদ্ধিশক্তি সমূহের প্রয়োগের মাধ্যমে জয় করেছিলেন, ঐ

[১৭]। কোথাও 'ইদ্ধীভি' পাঠের প্রয়োগ দেখা যায়।

ধর্মের (সত্য) প্রভাবে আপনার জয় ও মঙ্গল সাধিত হউক।

পৃষ্ঠভূমি : এ গাথার কেন্দ্রবিন্দু হল প্রাণসংহারক হিংসক অঙ্গুলিমালের চিত্তবিকার, আর অঙ্গুলিমালের পুনরায় অহিংসকে পরিবর্তনের কথা।[১৮]

বুদ্ধকালীন কোশল জনপদের রাজধানী শ্রাবস্তী। ঐ কোশল জনপদের রাজা ছিলেন প্রসেনজিৎ। তাঁর রাজপুরোহিতের নাম ছিল ব্রাহ্মণ ভার্গব। ভার্গবের পত্নীর নাম ছিল ব্রাহ্মণী মন্তানী। চৌর-নক্ষত্রে তাঁদের প্রথম পুত্র-সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। তার ঐ জন্মলগ্নে নগরীর শস্ত্রাগারে রক্ষিত অস্ত্রশস্ত্র হঠাৎ চমকে যায়। আপনা-আপনি ওগুলো হতে থেমে থেমে বেশ কিছুকাল সংঘাতের ঝন্‌ঝনানি শব্দ শোনা গিয়েছিল। এমন কি রাজার ব্যক্তিগত অস্ত্রগুলোতেও তেমন হয়। একাধিক গণকের মাধ্যমে রাজা ও জাতকের মাতাপিতা এর কারণ জানার চেষ্টা করেন। অধিকাংশেরই একই কথা-- এ জাতকের জন্মলগ্নের মাধ্যমে সম্ভাব্য ভয়ানক নরসংহার। এ ভবিষ্যবাণী শুনে সম্ভাব্য দোষমুক্তি ও সন্তানের মঙ্গলকামনায় মাতাপিতা নানা উপায় অবলম্বন করেন। এমন প্রয়াসের অঙ্গরূপে নামকরণ-সংস্কারে মাতাপিতা তার নাম রাখেন 'অহিংসক'।

এ নামকরণের পেছনে তাদের উদ্দেশ্য ছিল এ শুভ নামের প্রভাবে এ সন্তান কারও প্রতি হিংসাভাব পোষণ করবে না। আবার তারও প্রতি কেহ হিংসক হবে না। এর সুবাদে সম্ভাব্য ভয়ানক নরসংহার হতে একে ও কোশল জনপদবাসীকে রক্ষা করা যেতে পারে। এ

১৮। মজ্ঝিমনিকায়ের অঙ্গুলিমালসুত্তের ও থেরগাথার অন্তর্গত অঙ্গুলিমাল-থেরগাথার ভিত্তিতে গাথাটি তৈরী করা হয়েছে আর এর অট্‌ঠকথার ভিত্তিতে এর বিশদ্ বর্ণনা প্রস্তুত করা হয়েছে।

নামকরণের আরেকটি কারণ ছিল। সেটি হল তার ঐ জন্মলগ্নে কোশল জনপদবাসীর কোন প্রকারের প্রাণহানি হয় নি।

ক্রমান্বয়ে কাল কেটে যায়। মাতাপিতা ও পাড়া-প্রতিবেশীদের স্নেহ ও আদরে অহিংসক বড় হতে থাকে। চৌর-লগ্নে তার জন্মের কথা ও গণকদের ভবিষ্যদ্বাণীর কথা সবাই ভুলে যায়। অহিংসক বন্ধু-বান্ধবদের সকলের কাছে খুব আদরের হয়ে উঠে। বাল্যাবস্থা কাটিয়ে উঠলে মাতাপিতা তাদের সন্তানকে পরম্পরার অনুকূল শাস্ত্রবিদ্যায় পারঙ্গত করে তুলতে তৎকালীন খ্যাতিপ্রাপ্ত আচার্য-প্রাচার্যের তত্ত্বাবধানে শিক্ষা-দীক্ষাদানের উদ্দেশ্যে অন্য বাল্য-বন্ধুদের সাথে তক্ষশিলায় পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। অল্প সময়ের মধ্যেই যুবক অহিংসক লেখায়-পড়ায়, খেলায়-ধুলায় আর তার বিনম্র চাল-চলনে আচার-ব্যবহারে শিক্ষকগণের বিশেষত আচার্য ও গুরুমাতার সুদৃষ্টি আকর্ষণ করে। অন্যান্য সহপাঠীদের তুলনায় সে অধিক প্রিয়ভাজন হয়। এতে স্বভাবতই অন্য সহপাঠীর বিশেষত শ্রাবস্তীর রাজপরিবারস্থ বন্ধু-বান্ধবরা অপেক্ষাকৃতভাবে উপেক্ষিত হচ্ছে বলে মনে করে অহিংসকের প্রতি ঈর্ষাভাব পোষণ করতে থাকে। কোন কিছুতেই তাকে পরাস্ত করতে না পারায় তারা এবার নিজেরাই তাদের ঈর্ষানলে জ্বলতে থাকে।

এ জ্বালার যন্ত্রণা পূর্বে চাপা থাকায় অহিংসক এ সবের কিছুই বুঝতে পারে নি। পরবর্তীকালে সে বুঝতে পারে তার বাল্য-বন্ধুরা আগের মতো নেই। আগের মতো তারা তাকে খোলামেলাভাবে গ্রহণ করছে না। তা সত্ত্বেও অহিংসক কোন ভ্রূক্ষেপ না করে নিজের লেখায়-পড়ায় বেশী মন দেয়। পরিণামে অহিংসকের অপ্রত্যাশিত উন্নতিতে তারা আরও অধিক ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়ে। ঈর্ষানলের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে এবার তারা অহিংসকের উন্নতিতে বাধা দানের চক্রান্ত করতে

শুরু করে। তার চাল-চলনের ব্যাপারে কুৎসা রটাতে থাকে। কর্ণমন্ত্রণা করে শিক্ষকদের কাছে তার বিরুদ্ধে মিথ্যে অভিযোগ করতে থাকে।

এত সব করেও তার ক্রমোত্তর উন্নতিতে কোন প্রকারের বাধা সৃষ্টি করতে না পারায় তারা নাছোড়-বান্দা হয়ে কোমর কষে নামে। এবার তারা তার দুরাচারী হবার মোক্ষম অস্ত্র প্রয়োগ করেন। শেষ চালের অঙ্গ হিসেবে তারা একে একে কয়েকবারে গুরুমায়ের সাথে অহিংসকের অনৈতিক দৈহিক সম্বন্ধের কথা শুনিয়ে শুনিয়ে প্রাচার্যের কান ভরতে শুরু করে দেয়।

এতে প্রাচার্য বিচার-শক্তি হারিয়ে ক্ষুব্ধ হন আর অহিংসককে আশ্রম থেকে বিতাড়িত হবার নির্দেশ দেন। এ অপ্রত্যাশিত নির্দেশে অহিংসক বড়ই ব্যথিত হয়। এ নির্দেশ প্রত্যাখান করার আকুতি-মিনতি করতে থাকে অহিংসক সবার কাছে বিশেষত প্রাচার্যের কাছে। কিন্তু কিছুতেই প্রাচার্যের পাষাণ হৃদয় গলে নি। প্রাচার্য ছলে বলে কৌশলে অহিংসককে শুধু আশ্রম থেকে নয়, এমন কি তক্ষশিলা থেকেও নির্বাসনের ব্যবস্থা করেন। অহিংসকের পীড়াপীড়িতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে শেষে প্রাচার্য বলে ফেলেন--- 'এক শর্তে রাখা যেতে পারে।' অহিংসকও আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলে ফেলে--- 'যে শর্তই হউক না কেন তা পূর্ণ করবো। আমায় আপনাদের স্নেহ-সান্নিধ্য পাশ হতে বঞ্চিত করবেন না।'

প্রাচার্য বলেন--- 'তোমাকে এর জন্যে গুরুদক্ষিণা দিতে হবে।' অহিংসক বলে--- 'আমি তো প্রস্তুত আছি। বলুন না, আমায় গুরুদক্ষিণারূপে কি দিতে হবে?' প্রাচার্য বলেন--- 'এক হাজার মানুষের ডান হাতের কাটা আঙ্গুল।' অহিংসক প্রাচার্যের শর্ত শুনে হতবাক। সে আর কোন কথা না বলে ভারাক্রান্ত মনে আশ্রম থেকে

বেরিয়ে পড়ে। তক্ষশিলার সীমানা পেরিয়ে সে কোশল জনপদের সীমানায় পা রাখেন। এবার চিন্তে করে সে কি করবে? আশ্রম থেকে বহিস্কৃত হবার অপমান আর গুরু কর্তৃক এক হাজার মানুষের আঙ্গুল গুরু-দক্ষিণায় দেবার শর্তের কথা সে কিছুতেই ভুলতে পারছিল না।

কিছুদিনের পর পরই ঐ অপমান ও গুরুদক্ষিণার নির্দেশ তার নির্মল মনকে দুষিয়ে ফেলত। ঘন ঘন দূষিয়ে বিষিয়ে যাওয়ায় অহিংসকের হৃদয়ে হিংসার আগুন জ্বলে উঠে। মানবের আর মানব-সমাজের প্রতি তার হিংসা দাবানলের রূপ ধারণ করে। ঘনঘোর মোহান্ধ হয়ে সে সংকল্প নেয় হিংসার বদলা হিংসা দিয়ে আর হাজার মানুষের হাজার আঙ্গুল কেটে গুরুদক্ষিণা দিয়ে এ অপমানের বদলা নিতে হবে।

শ্রাবস্তীর জনসমাজে থেকে ঐ ভয়ানক সংকল্পের পূর্তি কখনও সম্ভব নয়। তাই সে জনসমাজে না থেকে ঘন অরণ্যে থাকার সংকল্প নেয়। কত তাড়াতাড়ি গুরুর নির্দেশিত গুরুদক্ষিণা অর্থাৎ হাজার মানুষের হাজার আঙ্গুল কেটে পুনরায় তক্ষশিলার আশ্রমের প্রবেশাধিকার পেয়ে নিজেকে কলঙ্কমুক্ত ও যোগ্য শিষ্য হবার প্রমাণ দিতে পারবে এবং মা-বাবার কাছে সসম্মানে ফিরে যেতে পারবে এই দুর্দমনীয় বশবর্তী হয়ে অহিংসক দিনে এক দুটো করে মানুষ কেটে তাদের আঙ্গুল দিয়ে মালা বানিয়ে গলায় ধারণ করে। কেহ পালিয়ে প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করলেও রেহাই ছিল না। হরিণের গতিতে দৌড়ে তাকে হত্যা করতো। ত্বরিতে লক্ষ্য প্রাপ্তির তাগিদে ছেলে-বুড়ো, নর-নারীর ভেদাভেদ নির্বিশেষে সবাইকে হত্যা করতে থাকে।

তার ভয়ে পথচারীরা মুখ্য পথ ছেড়ে অন্য পথ দিয়ে যাতায়াত করতে শুরু করে দেয়। বণিকেরাও তা করে। শেষে অঙ্গুলিমালও তার নিবাস-স্থান বদলাতে থাকে। এতে পার্শ্ববর্তী জনপদসমূহ হতে

কোশল জনপদে প্রবেশের প্রায় সব পথ অবরুদ্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়। কোশল জনপদে ছেলে-বুড়ো সবার মুখে এক নাম 'অঙ্গুলিমাল' ছড়াতে থাকে। সব পথ পথচারীরহিত হওয়ায় কোশল জনপদবাসীরা একপ্রকারে কারারুদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। প্রায় প্রতিদিনই রাজ-দরবারে বা স্থানীয় প্রশাসকদের দরবারে জনগণের বিক্ষোভ প্রদর্শন হত। নানা প্রান্তে ভয় ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়।

রাজপুরোহিত ভার্গবের কাছে রাজার সন্দেশ আসে অঙ্গুলিমালকে বোঝানোর। পিতা ভার্গব সরাসরি জবাব দেন--- 'এমন কলঙ্কিত পুত্রের প্রয়োজন নেই। রাজার যেমন ইচ্ছে তেমন করা হউক।' জনগণের বিক্ষোভ প্রশমনের উদ্দেশ্যে রাজা প্রসেনজিৎ তাঁর রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে সেনাবাহিনী পাঠান। তাদের নির্দেশ দেন--- ধরে বেঁধে যেভাবেই হোক না কেন অঙ্গুলিমালকে তাঁর সামনে আনতে হবে। তা সম্ভব না হলে তার মাথা কেটে আনতে হবে।

রাজার এ নির্দেশে অঙ্গুলিমালের উৎপাতের মাত্রা কমে নি, বরং ক্রমশ বেড়েই চলেছিল।

এতদিনে তার গলার মালায় গাথা আঙ্গুলের সংখ্যা বেড়ে গিয়ে হয়েছিল নয়শত নিরানব্বই। আর প্রয়োজন মাত্র একটির। ওটি সংগ্রহ করতে পারলেই যেন তার এক মহান লক্ষ্য পূর্তি হবে। সে যেতে পারবে তক্ষশিলায় গুরুর কাছে। সে ফিরে পাবে গুরু ও গুরুমায়ের স্নেহ-সান্নিধ্য। এ কথা ভেবে ভেবে মাঝে মাঝেই সে প্রচণ্ড অট্টহাস করে উঠত। 'শর্তপূর্তি এই হবে, এই হবে'- এ আশায় অঙ্গুলিমাল কাল কাটাচ্ছিল।

কিন্তু পথ পথচারীশূন্য হওয়ায় ঐ একটি আঙ্গুল পাওয়াটাই তার কাছে দুষ্কর হয়ে উঠেছিল।

অন্যদিকে অহিংসকের অর্থাৎ অঙ্গুলিমালের মায়ের মন পুত্রের প্রাণ-রক্ষার্থে ব্যাকুল হয়ে উঠে। রাজার আদেশের কথা শুনে তো তিনি কয়েকবার মূর্ছা যান। তিনি তার ছেলেকে কিছুতেই অঙ্গুলিমালরূপে দেখতে চান না। ঐ অশুভ শব্দও মুখে আনেন না। তার কাছে তার ছেলে আজও অহিংসক। চারদিক থেকে অঙ্গুলিমালকে সশস্ত্র সেনাবাহিনী দিয়ে ঘিরে ফেলার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এবার বোধ হয় তার অহিংসক আর বাঁচতে পারবে না। এ কথা ভেবে ভেবে তার দুশ্চিন্তার মাত্রা হু হু করে বেড়ে যায় দিন দিন। রাজার কাছে তার সন্তানের প্রাণ-ভিক্ষার সব কাতর অনুনয়-বিনয় ব্যর্থ যায়। আর গত্যন্তর না দেখে বৃদ্ধা মা এবার ঘর-পরিবার ছেড়ে একাই বেরিয়ে পড়েন। কেঁদে কেঁদে এবনে ওবনে 'অহিংসক, অহিংসক' চিৎকার করে খুঁজতে থাকেন তিনি। ক্রমান্বয়ে কয়েকদিন নিরন্তর নিরাহারে ও অনিদ্রায় দুর্বল হয়ে পড়েন তিনি। চলার শক্তি ক্রমশ হারিয়ে ফেলেন। তবুও সন্তান-স্নেহে 'অহিংসক, তুমি কোথায়? তুমি কোথায়' বলে চেঁচিয়ে চলেছিলেন বৃদ্ধা মা। এভাবে শ্রাবস্তী হতে তিন যোজন দূরে জালিনী (জালি) বনে পৌঁছোন ঐ বৃদ্ধা মা।

হঠাৎ বহুদিন পর এক মানুষের শব্দ শুনে অঙ্গুলিমাল অট্টহাস করে উঠে-- 'হা, হা, হা, কোথায় অহিংসক? কে অহিংসক? কোথাকার অহিংসক? এখানে এই ঘন অরণ্যে কোন অহিংসক নেই। অঙ্গুলিমাল আছে। আমি অঙ্গুলিমাল। সবাই আমাকে অঙ্গুলিমাল বলে ডাকে। এই দেখছো না আমার গলায় আঙ্গুলের মালা। এতে নয়শত নিরানব্বইটি মানুষের কাটা আঙ্গুল রয়েছে। আর প্রয়োজন মাত্র একটির। ব্যস, তা হলেই হল। হা, হা, হা' আবার অট্টহাসি অঙ্গুলিমালের। 'তুমি কে?' বৃদ্ধা উত্তর দেন-- 'বাছা, অংহিসক, আমি যে তোর মা। আমাকে চিনতে পারছিস না, বাবা অহিসংক।' অঙ্গুলিমাল অট্টহাস করে বলে--

'কে মা? কোন্ মা? আমি কাউকে চিনি না। আমি দেখছি শুধু তোমার আঙ্গুল।' এই বলে খড়্গ উঁচিয়ে চলেছিল অঙ্গুলিমাল।

বুদ্ধ তখন তাঁর বিংশতিতম বর্ষাবাস জেতবন বিহারে যাপন করছিলেন। প্রতিদিনকার নিয়ম অনুসারে প্রত্যূষকালে শ্রাবস্তীর জেতবন-আরামে শাস্তা ধ্যানে রত হয়ে তাঁর দিব্যদৃষ্টি বিস্তার করেন। জানতে চেষ্টা করেন আজ কার মহোপকার করতে পারবেন তিনি? তাঁর দৃষ্টি-পথে অঙ্গুলিমাল ও তার বৃদ্ধা মা গোচরীভূত হয়। আরও জানতে পারেন--- তাদের ভূত-ভবিষ্যৎ, বিশেষত অঙ্গুলিমালের।

অঙ্গুলিমালের হাতে মাতৃহত্যাজনিত ঘৃণিত পাপ সম্পাদিত হলে তার সম্ভাব্য দুষ্পরিণামের কথাও জানতে পারেন শাস্তা। এমন পাপকর্ম হতে রক্ষা পেলে অঙ্গুলিমালের অরহত্বফল প্রাপ্তির সম্ভাবনার কথাও জানেন শাস্তা। সম্ভাব্য মাতৃ-হত্যা জনিত মারাত্মক ভুলের কারণে অঙ্গুলিমালের অবশ্যম্ভাবী অনন্তকালীন নারকীয় যাতনা ভোগের কথা ভেবে মহাকরুণাবশত শাস্তা তৎক্ষণাৎ জেতবন হতে অন্তর্ধান হন আর কোশল জনপদের কুখ্যাত জালিনী বনে বৃদ্ধা মা ও অঙ্গুলিমালের মাঝে আবির্ভূত হন।

ঠিক ঐ সময়ে অঙ্গুলিমাল তার খড়্গ উঁচিয়ে তার মাকে কোপ বসাতে যাচ্ছিল। অঙ্গুলিমালের দৃষ্টিপথে এবার বৃদ্ধা নারীর স্থলে বুদ্ধ এসে পড়েন। বৃদ্ধাকে হত্যার করার কথা ভুলে যান।

বুদ্ধ তাঁর এমন ঋদ্ধি-শক্তির প্রয়োগ করেছিলেন যে অঙ্গুলিমালের মনে হচ্ছিল এক দিব্য শ্রমণ দৌড়োচ্ছেন। অঙ্গুলিমাল তার সমস্ত বল প্রয়োগ করেও তাঁর কাছে পৌঁছতে পারছিল না। শেষে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে সে দাঁড়িয়ে পড়ে। ভাবতে থাকে-- 'এ কেমন মানুষ?', 'এ কেমন শ্রমণ?' আমি ধাবমান হরিণকেও ধরতে পারি, অথচ আজ এ

মানুষকে ধরতে পারলাম না। কে এই শ্রমণ?' শেষে অঙ্গুলিমাল হার মেনে বলে ফেলে-- 'হে শ্রমণ, থামো থামো। আর দৌড়িও না।'

বুদ্ধ--- আমি তো স্থির আছি। বরং তুমিই দৌড়াচ্ছো। তুমি এবার থামো।'

অঙ্গুলিমাল ভাবতে থাকে--- 'এ আবার কেমন কথা? ঐ শ্রমণ দৌড়োলো বলেই তো আমি দৌড়ে দৌড়ে ক্লান্ত হলাম। আমাকে থেমে যাবার তাঁর পরামর্শ মানলাম ঠিক, কিন্তু 'সে দৌড়োচ্ছে না, থেমে আছে' এটা কি করে মেনে নিই। শ্রমণেরা মিথ্যে কথা বলেন না। তা হলে আমি যে শ্রমণকে দৌড়োতে দেখলাম তা কি মিথ্যে? নিশ্চয়ই শ্রমণের ঐ কথার পেছনে কোন রহস্য রয়েছে। তা জানতে হবে।'

রহস্য জানার আগ্রহে অঙ্গুলিমাল বলেন--- 'হে শ্রমণ, শ্রমণগণ তো মিথ্যে কথা বলেন না। তুমি এমন কথা কেন বললে?'

বুদ্ধ--- 'হে অঙ্গুলিমাল, সত্ত্বের কৃত কর্মের সংযোজনের দণ্ড ত্যাগ করেছি। আমি স্থির আছি (সংসারের আবাগমন অর্থাৎ আসা-যাওয়া অবরুদ্ধ হয়েছে)। কিন্তু সেই আবাগমনের কর্মের দণ্ড নিয়ে তুমি (এ সংযোজনার) সংসারের গতি পথে আজও আছো ধাবমান। কাজেই তুমি শ্রান্ত, অথচ আমি শান্ত। তুমিও আমার ন্যায় শান্ত হও।' তাই বলেছিলাম-- 'আমি স্থির। তুমি ধাবমান। তাই তোমাকে শান্ত হবার পরামর্শ দিয়েছি।'

অঙ্গুলিমাল ভাবতে থাকেন-- 'এবার জানতে পারলাম শ্রমণের ঐ কথার রহস্য'। বুদ্ধের ঐ কথা শোনা মাত্রই তার সারা মন-মস্তিষ্কে এক অদ্ভূত তরঙ্গ বয়ে যায়। বোধশক্তি ফিরে আসে তার অন্তরে--- 'এ শ্রমণ নিশ্চয়ই একজন অসাধারণ শ্রমণ। নিশ্চয়ই তার হিতার্থে

এমন মহারণ্যে এ মহাশ্রমণের আগমন হয়েছে।' তার অন্তরে জ্ঞানের সঞ্চার হয়। প্রাণী হত্যার দুষ্পরিণামের কথা বুঝতে পারে অঙ্গুলিমাল।

আর কালবিলম্ব না করে পাশের পর্বত-প্রপাতে খড়্গাদি অস্ত্র ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ঐ মহাশ্রমণের চরণে শরণাপন্ন হয় অঙ্গুলিমাল। মাথা নত করে সে শরণপ্রার্থী হয়। শাস্তা কর্তৃক 'এস ভিক্ষু' বলতেই ঋদ্ধিশক্তিতে পাত্র-চীবর আবির্ভূত হয়। ঐ পাত্র-চীবর দিয়ে অঙ্গুলিমালের উপসম্পদা সম্পন্ন হয়।

এরপর অঙ্গুলিমাল গৈরিক বস্ত্রধারী হয়ে তথাগত বুদ্ধের অনুগামী হন। উভয়ে শ্রাবস্তী ফিরে আসেন। এর পর বিনয়ের বিধান সম্পর্কে অঙ্গুলিমাল অবহিত হন। বিনয়ের বিধান মতে দ্বাদশ ধুতাঙ্গযত্রিব্রত ধারণ করার সংকল্প নেন তিনি। শাস্তার নির্দেশে ধ্যানাভ্যাসে রত হন আর অল্পসময়ের মধ্যেই তিনি অরহত্ব-ফলে প্রতিষ্ঠিত হন।

একদিন কাউকে কিছু না বলে না কয়ে ভগবান বুদ্ধ অঙ্গুলিমালকে অনুগামী শিষ্যরূপে নিয়ে কোশলরাজ প্রসেনজিতের রাজপ্রাসাদে যান। আসন গ্রহণের পর রাজাকে চিন্তাগ্রস্ত দেখে কথা-প্রসঙ্গে চিন্তার কারণ জানতে চান শাস্তা। উত্তরে রাজা অঙ্গুলিমালের উৎপাতের কথা বলেন। আরও বলেন--- 'ঐ অঙ্গুলিমালকে বশে আনতে পারলে ভয়ানক দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পেতাম।' মহারাজকে দুশ্চিন্তা থেকে অতিশীঘ্র মুক্তি পাবার আশীর্বাদ দিয়ে কথা-প্রসঙ্গে ভগবান বুদ্ধ তাঁকে বলেন-- 'মহারাজ, কোশলবাসীর হিতার্থে যদি ঐ অঙ্গুলিমাল আপনার কাছে নিজে এসে ধরা দেন তবে আপনার প্রতিক্রিয়া কি হবে?'

রাজা বলেন-- 'যাকে সহস্রাধিক সৈন্য ধরে আনতে পারছে না সে নিজে এসে ধরা দেবে কেন? অসম্ভব। একেবারে অসম্ভব কথা এটি।' এর পর অঙ্গুলিমালের দিকে সংকেত দেখিয়ে শাস্তা বলেন-- 'ইনিই

অঙ্গুলিমাল।'

'অঙ্গুলিমাল' নাম শুনতেই রাজা নিজ আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়েন। তার গাল বেয়ে কপাল বেয়ে ঘাম বেরোতে থাকে। ভাবতে থাকেন-- 'এ তো শান্ত-দান্ত একজন সুশীল ভিক্ষু। এ কি করে অঙ্গুলিমাল হবেন?' 'যেই দুর্ধর্ষ অঙ্গুলিমালকে শত শত সশস্ত্র সেনাবাহিনী ধরতে পারে নি তাকে কি করে ভগবান বুদ্ধ বিনা অস্ত্রবল প্রয়োগে ধরলেন? কি করে তাকে ভিক্ষু-ধর্মে দীক্ষিত করালেন?'--- এসব ভেবে ভেবে চকিত হন রাজা। রাজা নিজের চোখে দেখা ঘটনাকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না মোটেই। কিন্তু ভগবান বুদ্ধের কথাকেও অবিশ্বাস করেন কি করে? শেষে নিজেকে সামলে নিয়ে রাজা আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে নতমস্তকে শাস্তা সুগত বুদ্ধের অনুগামী শিষ্য অঙ্গুলিমালকে অভিবাদন জানালেন। আর নিবেদন করেন-- 'ভন্তে, আজ হতে আপনার চতুর্প্রত্যয় দানের ভার আমার।' প্রত্যুত্তরে অঙ্গুলিমাল বলেন-- 'আমি শাস্তার নির্দেশে ধুতাঙ্গ ব্রতধারী হয়েছি। চতুর্প্রত্যয়ের দাতার প্রয়োজন নেই।'

সুশীল ভিক্ষুরূপে পেয়ে দস্যু অঙ্গুলিমালকে ধরে বা মেরে আনার উদ্দেশ্যে প্রেরিত সৈন্য-সামন্তকে স্বস্থানে ফিরে আসার আদেশ দেন রাজা। রাজা দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পান। মহাকারুণিক বুদ্ধের আশ্চর্য ঋদ্ধি-বলের পরিচয়ে রাজা অধিক শ্রদ্ধাশীল হন। কৃতজ্ঞতায় রাজা শাস্তাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানান।

এর মধ্যেই সারা শ্রাবস্তীবাসীর কাছে এ খবর দাবানলের ন্যায় ছড়িয়ে পড়ে--- 'অঙ্গুলিমাল ভগবান বুদ্ধের শরণাপন্ন হয়েছেন। ধুতাঙ্গ-ব্রতধারী ভিক্ষু হয়ে তিনি শ্রাবস্তী-বাসীর দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করেন।' কয়েকদিন পর এভাবে ভিক্ষান্ন-সংগ্রহে বের হলে

অলিতে-গলিতে রব ছড়িয়ে পড়ে--- 'অঙ্গুলিমাল এসেছে, অঙ্গুলিমাল এসেছে।'

অনেকে ভয়ে দরজা-জানালা বন্ধ করে দেয়। আবার অনেকে উৎসুকতা নিয়ে দরজা-জানালার পাল্লা আধ খোলা অবস্থায় অঙ্গুলিমালকে দেখতে চান। নয় শত নিরানব্বই জন নিরাপরাধী মানুষের ঘাতককে কে না দেখতে চাইবে? তাও আবার নিরস্ত্র ভিক্ষুর বেশে। আবার অনেকে যাদের আত্মীয়-স্বজন, মা-বোন, ভাই-বন্ধু অঙ্গুলিমালের কোপে প্রাণ হারিয়েছেন, স্বজন-প্রিয়জন বিয়োগের ক্ষোভ মেটানোর উদ্দেশ্যে ভিক্ষাপাত্রে অন্নদানের পরিবর্তে তাঁর ভিক্ষা-পাত্র কেড়ে নিয়ে ভেঙ্গে দেন। এমন লোকদের অনেকে দুর থেকে ঢিল-পাটকেল ছুঁড়ে অঙ্গুলিমালকে রক্তাক্ত করে দেন।

মাঝ পথ হতে ভাঙ্গা ভিক্ষা-পাত্র হাতে শাস্তার কাছে ফিরে আসেন। সব বৃত্তান্ত শাস্তাকে শোনান। তাঁর কাছ হতে আদেশ-নির্দেশ পেতে চান অঙ্গুলিমাল। ধর্মোপদেশ দান দিয়ে শাস্তা বলেন-- নয়শত নিরানব্বই জন নিরাপরাধীর হত্যাজনিত পাপের দুষ্পরিণামের সুনিশ্চিত ভয়ানক নারকীয় যাতনার তুলনায় এ যাতনা অতি তুচ্ছ। সহনশীলতা বাড়িয়ে ক্ষমা দিয়ে মহানতার পরিচয় দেবার উপদেশ দেন শাস্তা।

শাস্তার নির্দেশ মতে অঙ্গুলিমাল ক্ষুব্ধ জনতার ক্ষোভ-জনিত চোট-পাট ও অত্যাচার সব নীরবে সহ্য করেন। এভাবে কিছু কাল নীরবে কাটাতেই জনতার ক্ষোভ ক্রমশ কমতে থাকে। অঙ্গুলিমালের এ অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন দেখে নগরবাসী মুগ্ধ হন। ঢিল-পাটকেল ছোঁড়ার পরিবর্তে এবার তারা তাঁর ভিক্ষাপাত্রে পিণ্ডদান দিতে থাকেন।

আরেক দিনের ঘটনা অঙ্গুলিমাল ভিক্ষু ভগবান বুদ্ধের অনুগামী হয়ে

শ্রাবস্তীর কোথাও যাচ্ছিলেন। মাঝ পথে পথ-প্রান্তে স্থিত এক কুটি হতে নারীর আর্তনাদ শুনতে পান অঙ্গুলিমাল। ঐ কুটিরের কাছে গিয়ে জানতে পারেন-- কুটিরস্থ নারী গর্ভবতী। তাই আসন্ন প্রসব-পীড়া সহ্য করতে না পেরে 'ত্রাহি, ত্রাহি' করছে ঐ গর্ভবতী নারী। এভাবে কয়েকদিন কেটে গেছে। তার ঐ তার-স্বরে করুণ আর্তনাদ শুনে অঙ্গুলিমালের হৃদয় গলে যায়। তিনি থাকতে না পেরে শাস্তার কাছে ফিরে এসে ঐ গর্ভবতীর নারীর প্রসব-পীড়া দুর করার উপায় প্রার্থনা করেন।

অঙ্গুলিমাল - ভগবন, এক ভগিনী প্রসববেদনায় কাতরাচ্ছে। তার প্রসব-পীড়া আমার কাছে অসহনীয় হয়ে দাড়িয়েছে। ভগবন, আপনি তো মহাকারুণিক। তার প্রসব-পীড়া হরণ হয় এমন আশীর্বাদ আমি কাতরভাবে প্রার্থনা করি আপনার কাছে।

বুদ্ধ - অঙ্গুলিমাল, তোমার হৃদয়ে আর্তের প্রতি প্রথম করুণার ভাব অঙ্কুরিত হয়েছে। তার বিকাশ ও অভিব্যক্তি হওয়া অত্যাবশ্যক। তা না হলে তা অঙ্কুরে বিনষ্ট হবে। কাজেই ঐ প্রসবপীড়ার আর্তি হরণের ব্যাপারে তোমার ক্ষমতা ও করুণার প্রয়োগ কর।

অঙ্গুলিমাল - আমি কি তার প্রসব-পীড়া হরণে সমর্থ?

বুদ্ধ - তোমার মধ্যে যে ক্ষমতা রয়েছে, অবশ্যই তা তোমাকে জানতে হবে। জানলে পরে তার প্রয়োগ নিজের ও পরের উভয়ের কল্যাণে প্রয়োগ করতে পারবে।

অঙ্গুলিমাল - আমাকে কি করতে হবে, তা হলে তা বলুন।

বুদ্ধ - তোমাকে সত্য-ক্রিয়া করতে হবে।

অঙ্গুলিমাল - সত্য-ক্রিয়া কি করে করতে হয়?

বুদ্ধ - কোন এক সত্য ঘটনাকে ভিত্তি করে অধিষ্ঠান করতে হবে।

অঙ্গুলিমাল - আমায় শিখিয়ে দিন। আমি প্রস্তুত আছি।

বুদ্ধ - তুমি অধিষ্ঠান (সংকল্প বচনের স্থাপন) কর--- 'এ জীবনে আমি একটি প্রাণীরও হত্যা করি নি।' 'একথা যদি সত্য হয়, তা হলে এ সত্যের প্রভাবে ঐ গর্ভবতী নারীর প্রসববেদনা অচিরেই দূর হউক।' একেই বলে সত্যক্রিয়া।

অঙ্গুলিমাল - আমি এ অধিষ্ঠান বা সত্যক্রিয়া করতে পারবো না।

বুদ্ধ - কেন পারবে না?

অঙ্গুলিমাল - অতীত জন্মের প্রাণী-হত্যার কথা তো বাদ দিন। শুধু এ জীবনে নয় শত নিরানব্বই জন নিরাপরাধী মানুষকে মেরেছি। এত সব করার পর আমি কি করে অধিষ্ঠান (সঙ্কল্প স্থাপনা) গ্রহণ করবো যে আমি এ জীবনে একটি প্রাণীও হত্যা করি নি। এত বড় মিথ্যে কথা আমি বলতে পারবো না। এত বড় মিথ্যে কথা বলে নিজেকে প্রবঞ্চিত করতে পারবো না।

বুদ্ধ - এটা যদি বলতে না পারো, তবে আরেকটি কথা বলতে পারবে কি?

অঙ্গুলিমাল - কোন্ কথা?

বুদ্ধ - বুদ্ধের শরণাপন্ন হবার পর থেকে আমি একটি প্রাণীও হত্যা করিনি। --- এ কথা যদি সত্যি হয়ে থাকে তবে এ সত্যের প্রভাবে ঐ গর্ভবতী নারীর প্রসব-পীড়া অচিরেই দূর হউক।

অঙ্গুলিমাল - হ্যাঁ, একথা বলতে আমার কোন আপত্তি নেই। এ তো অতি সত্যি কথা।

বুদ্ধ - আয়ুষ্মান, যাও এবার ঐ নারীর কাছে। এ সত্যক্রিয়া কর।

অঙ্গুলিমাল - ভগবান আশীর্বাদ বর্ষণ করুন।

একথা বলে অঙ্গুলিমাল আর কালবিলম্ব না করে ঐ গর্ভবতী নারীর কুটিরের পাশের একটি পাথরে বসে শাস্তার নির্দেশ মতে সত্যক্রিয়ার এই ভাবে অধিষ্ঠান করেন----

'যতোহং ভগিনী, অরিয়ায় জাতিয়া জাতো,
নাভিজানামি সঞ্চিচ্চ পাণং জীবিতা বোরোপেতা,
তেন সচ্চেন সোত্থি তে হোতু গব্ভস্স।'

"হে ভগিনী বুদ্ধের শরণাপন্ন হয়ে আর্যজাতিতে জন্ম নেবার অর্থাৎ অর্হৎ হবার পর থেকে সজ্ঞানে আমি একটি প্রাণীও হত্যা করি নি। যদি এ কথা সত্য হয়ে থাকে তবে এ সত্যের প্রভাবে আপনার প্রসব-পীড়া অচিরেই দূর হউক।"

অধিষ্ঠান শেষ করতে না করতেই ঐ গর্ভবতী নারীর প্রসব-পীড়া দূর হয়। ঐ নারী এক পুত্র-সন্তান প্রসব করেন। ঐ অদ্ভূত ঘটনায় তিনি চকিত হন। একটি সত্য কথার যে এত মহান ফল হয় তা এখন কি করে অবিশ্বাস করা যায়। এতে অঙ্গুলিমাল অত্যধিক আনন্দিত হন। আনন্দ-মগ্ন হয়ে শাস্তার কাছে ফিরে আসেন। শাস্তাকে প্রণাম জানিয়ে সব কথা নিবেদন করেন।

শ্রাবস্তীর দিকে দিকে লোক-মুখে অঙ্গুলিমালের সত্যক্রিয়ার প্রভাবে এক গর্ভবতী নারীর প্রসবপীড়া হরণের ঘটনা প্রচারিত হয়ে পড়ে। শুধু তা নয় এর পর যখনই কোন গর্ভবতী নারীর প্রসব-পীড়া হতো তাকে ঐ পাথর ধোওয়া জল পান করিয়ে দেওয়া হতো। আর ঐ গর্ভবতী নারী প্রসব-পীড়া হতে মুক্ত হয়ে যেত।

ঐ হতে অঙ্গুলিমাল কৃত ঐ সত্যক্রিয়া বৌদ্ধ সাহিত্যে ও সমাজে 'অঙ্গুলিমাল-পরিত্ত' নামে অতিখ্যাত হয়।

অঙ্গুলিমাল-পরিত্তং

নিদানং

১। পরিত্তং যং ভণন্তস্স, নিসিন্নট্ঠানধোবনং,
উদকম্পি বিনাসেতি, সব্বমেব পরিস্সয়ং,
সোত্থিনা গব্ভমুট্ঠানং, যঞ্চ সাধেতি তং খণে।।

২। থেরস্স অঙ্গুলিমালস্স, লোকনাথেন ভাসিতং,
কপ্পট্ঠায়িং মহাতেজং, পরিত্তং তং ভণাম হে।।

৩। যতোহং ভগিনী, অরিয়ায় সুত্তং জাতিয়া জাতো,
নাভিজানামি সঞ্চিচ্চ পাণং জীবিতা বোরোপেতা,
তেন সচ্চেন সোত্থি তে হোতু গব্ভস্স।। (৩ বার)

বুদ্ধের প্রভাবে অঙ্গুলিমাল অহিংসকে পরিবর্তিত হলেও তিনি বৌদ্ধসাহিত্যে অঙ্গুলিমাল নামে বিশ্ব-বিশ্রুত হয়ে আছেন। তবে অর্হৎ অঙ্গুলীমালরূপে। শাস্ত্র মতে শাস্তা সুগতের শরণাপন্ন হবার পর দীর্ঘ দিন তিনি জীবিত ছিলেন না। শাস্তার মহাপরিনির্বাণের বহু পূর্বে তাঁর দেহাবসান ঘটেছিল।

[চতুর্থ গাথা পাঠের বা শোনার পূর্বে বা পাঠের ও শোনার সময় অহিংসকের অঙ্গুলিমালরূপে, আবার শাস্তার সান্নিধ্যে এসে অঙ্গুলিমালের অহিংসকরূপে অপ্রত্যাশিত পরিবর্তনজনিত সত্য ঘটনা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। অঙ্গুলিমালের একটি সামান্য সত্য কথার যদি ঐ অসাধারণ ফল হয়ে থাকে তবে সারা জীবন-চরিয়াই যাঁদের সত্যাশ্রিত এমন বোধিসত্ত্ব ও বুদ্ধগণের জীবনে ঘটিত মহান ঘটনাসমূহের ভিত্তিতে কৃত সত্যক্রিয়া কতখানি মহান ফলদায়ক হতে পারে তা অনুমেয়।]

৫। কত্বান কট্ঠমুদরং ইব গব্বিনীয়া,
চিঞ্চায় দুট্ঠবচনং জনকায়মজ্ঝে।
সন্তেন সোমবিধিনা জিতবা মুনিন্দো,
তন্তেজসা ভবতু তে জয়মঙ্গলানি।

শব্দার্থ :

কত্বান	-	(তৈরী) করে
কট্ঠং	-	কাষ্ঠ (ময়)
উদরং	-	উদর
ইব	-	ন্যায়
গব্বিনীয়া	-	গর্ভিনীর
চিঞ্চায়	-	চিঞ্চার দ্বারা (উচ্চারিত)
দুট্ঠবচনং	-	দুষ্টবচন (মিথ্যা অভিযোগ)
জনকায়মজ্ঝে	-	জনসমূহের মধ্যে
সন্তেন	-	শান্ত ভাব ধারণ করে
সোমবিধিনা	-	সৌম্য ভাব ধারণ করে
জিতবা	-	জয়ী (হয়েছিলেন)
মুনিন্দো	-	মুনীন্দ্র, মুনিদের ভিতর শ্রেষ্ঠ।

ভাবার্থ : কাঠের (গুড়োর পুটলী বেঁধে নকল) উদর বানিয়ে (গর্ভিনী হবার ভান করে) বিশাল জনসমূহ মাঝে অপবাদরতা দুষ্টমতি চিঞ্চাকে মুনীন্দ্র বুদ্ধ যে শান্ত ও সৌম্য (সত্য ও উপেক্ষা পারমিতা গুণে)

বিধিতে জয় করেছিলেন, ঐ ধর্মের (পারমিতা ও সত্যক্রিয়ার) প্রভাবে আপনার জয় ও মঙ্গল সাধিত হউক।

পৃষ্ঠভূমি : বুদ্ধের বিরূদ্ধে চিঞ্চা কর্তৃক মিথ্যারোপনমূলক ঘটনা এ গাথার বক্তব্য বিষয়ের কেন্দ্র বিন্দু। [১৯]

ভগবান বুদ্ধ তাঁর বোধি প্রাপ্তির পরবর্তী পঁয়তাল্লিশটি বর্ষাবাস নানা স্থানে কাটান। তবে শ্রাবস্তীতে সর্বাধিক বর্ষাবাস কাটান। বর্ষাবাস ছাড়াও শাস্তা শ্রাবস্তী-বাসীর আকর্ষণে ধর্মচারিকা-কালেও এখানকার দুই প্রমুখ বিহারে স্বল্পকালীন বিশ্রামের জন্যে কালে-অকালে অবস্থান করতেন।

বুদ্ধ যখন জেতবন বিহারে অবস্থান করছিলেন তখন জেতবন বিহারের অদূরে তাঁর সমকালীন নির্গ্রন্থ পরিব্রাজকদের মঠ ও আশ্রম ছিল। সেখানে বহু তাপস ও পরিব্রাজক থাকতেন। তবে বুদ্ধের ধর্ম ও সংঘের জনপ্রিয়তা দিন দিন বেড়ে চলে। আর সেই সাথে শ্রাবস্তীর রাজ-পরিবার ও অধিকাংশ শ্রেষ্ঠী-পরিবার ভগবান বুদ্ধের শরণাপন্ন উপাসক-উপাসিকা হয়ে পড়ায় নির্গ্রন্থী পরিব্রাজক সাধু-সন্ন্যাসীদের লাভ-সৎকার দিন দিন কমতে থাকে। এমন কি তাদের আজীবিকার ভিক্ষান্ন জুটানোও দুর্লভ হয়ে পড়েছিল। আজীবিকার সন্ধানে অনেকে শ্রাবস্তীর বাইরে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন।

একারণে বুদ্ধের ও তাঁর সংঘের জনপ্রিয়তা কমানোর উদ্দেশ্যে নানা ধরণের চক্রান্ত করার অপপ্রয়াসেও তারা পিছপা হন নি। বুদ্ধের ও তাঁর ভিক্ষু-সংঘের সংঘীয় জীবন এতই সুব্যবস্থিত ও সুবিনীত ছিল যে তাদের বিরুদ্ধে ছোটো খাটো দোষারোপ করে তাদের জনপ্রিয়তা

---

[১৯]। ধম্মপদ-অট্ঠকথার লোকবগ্গের চিঞ্চা-মাণবিকা-বত্থুর ভিত্তিতে এটির বর্ণনা তৈরী করা হয়েছে।

কমানো সম্ভব ছিল না। কাজেই পরিব্রাজক-সমূহের কিছু নেতৃ-স্থানীয় সন্ন্যাসীরা গোপনে বুদ্ধের বিরুদ্ধে বড়-সড় ধরণের চক্রান্ত করার চেষ্টা করে। নিষ্কলঙ্কিত বুদ্ধের জীবনে চারিত্রিক দোষারোপ করার উদ্দেশ্যে তারা তাদেরই পরিব্রাজক-সংঘের এক শিষ্যা চিঞ্চার (মাণবিকা) সাহায্য-প্রার্থী হন। ঐ চিঞ্চা ছিল যুবতী। আর ছিল সুন্দরী। তার উপরে সে ছিল বুদ্ধিমতি। তারা সবাই জানতো বুদ্ধের চরিত্র নষ্ট করা কখনই সম্ভব নয়। তাই কেবল তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা চারিত্রিক দোষারোপের ভার ঐ চিঞ্চা মানবিকার উপর দেয়। সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতার কারণে চিঞ্চা এতে তার সম্মতি প্রদান করে।

চিঞ্চা তার পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে প্রতিদিন সন্ধ্যার দিকে জেতবনবিহারে সান্ধ্যবন্দনা করার বাহানায় বুদ্ধদর্শনে যেতেন। লোক দেখানো বন্দনাদি কৃত্য সেরে গোপনে জেতবন থেকে চলে যেতেন নিজ আশ্রমে। কিন্তু প্রতিদিন প্রত্যূষকালে জেতবন বিহারের মুখ্য প্রবেশদ্বারের বাইরে ঘোরা-ফেরা করতো। প্রবেশেচ্ছুক পথচারীরা সে সময় জেতবন বিহারে চিঞ্চাকে দেখে-- 'কোত্থেকে আসছো, এই সাত-সকালে?' জিজ্ঞেস করলে চিঞ্চা উত্তর দিতো-- 'আর কোত্থেকে আসবো? দেখতেই তো পাচ্ছো জেতবন-বিহার থেকে আসছি।' এতো সকালে বুদ্ধ-বন্দনা কি করে সেরে ফেললে? চিঞ্চা উত্তর দিতো-- 'বন্দনা কেন করব? বুদ্ধের সাথে রাত কাটিয়েছি। এবার ফিরে যাচ্ছি। একি আর তেমন নতুন কথা। রোজই তো রাত কাটাচ্ছি।'

ক্রমান্বয়ে এভাবে কয়েকমাস গত হলে চিঞ্চা এবার কাপড়ের পুটলি পেটে বেঁধে গর্ভিনী হবার ভান করে ঐ নির্ধারিত সময়ে যাওয়া আসা করতে থাকে। আরও কয়েক মাস গত হলে সে আরও বড় কাপড়ের পুটলি বাঁধে। একবার ভগবান বুদ্ধ জেতবন বিহারে সান্ধ্যকালীন বিশাল জনসভায় ধর্মদেশনা দিচ্ছিলেন। বিশাল জন-সমাবেশ দেখে

চিঞ্চা মাণবিকা ভাবেন--- 'বুদ্ধের বিরুদ্ধে অপবাদ ছড়ানোর এই সুবর্ণ সুযোগ।' সুযোগ বুঝে চিঞ্চা মাণবিকা পেটে কাঠের বড় পুটলী বেঁধে বুদ্ধের সামনে দাঁড়িয়ে বুদ্ধের বিরুদ্ধে অভিযোগের সুরে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে থাকেন-- 'তোমার সন্তানের মা হতে চলেছি। সব জেনেও না জানার ভান করছো। গৃহী জীবনে স্বামীরা গর্ভবতী নারীর ও ভাবী সন্তানের সুরক্ষার কত ব্যবস্থা করে থাকেন। উপদেশ দানের বেলায় ভাল ভাল কথা বল, কিন্তু আমার বেলায় সে সব কিছুই করো নি। সত্যকে কতদিন ধামাচাপা দেবে। সত্য একদিন ফুটে উঠবেই। আমি আর তা চাপা থাকতে দেব না। আজ সবাইকে জানিয়ে দেব তুমি যে কত বড় ভণ্ড বৈরাগী।'

সুগত শাস্তা চিঞ্চার এত সব মিথ্যা অভিযোগ নীরবে শান্ত ও সৌম্যভাব ধারণ করে শুনছিলেন। অনেকের মনে জিজ্ঞাসা জাগে-- শাস্তা কেন নীরবে শুনছেন? কিছু বলছেন না কেন তিনি? অনেকে আবার ভাবেন-- হয়ত চিঞ্চার কথা সত্যি হবে, তা না হলে সে এত জোর গলায় চেচাচ্ছে কেন? শাস্তা সুগতও বা সব নিন্দা কেন নীরবে শুনছিলেন ।

অন্যদিকে দেবরাজ ইন্দ্রের আসন উত্তপ্ত হতে চলেছিল। সেই উত্তাপ শেষে এতই বেড়েছিল যে দেবরাজ ইন্দ্রের পক্ষে তা আর সহ্য করা সম্ভব হচ্ছিল না। এই অসহনীয় উত্তাপের কারণ জানতে পারলেন। লোকনায়ক দেবমানবের শাস্তা মহাকারুণিক তথাগতের বিরুদ্ধে চিঞ্চার মহা-মিথ্যা অভিযোগ। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর নৈতিক কর্তব্য পালনে তৎক্ষণাৎ তিনি নিজের এক দেবদূতকে ন্যায়োচিত বিধানের উদ্দেশ্যে পাঠান।

ঐ দেবদূত নেংটি ইঁদুরের বেশে সবার অলক্ষ্যে চিঞ্চা যখন হাত

উঁচিয়ে উঁচিয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বুদ্ধের নিন্দা করেছিলেন, ঠিক ঐ সময় ঐ নেংটি ইন্দুর চিঞ্চার অজ্ঞাতসারে সুতোর বাঁধনগুলো একে একে কেটে ফেলে। সুতো ছিন্ন ভিন্ন হওয়ায় ভারী কাঠের পুটলিটি ধপাস্ করে চিঞ্চার পায়ের আঙ্গুলে পড়ে। পায়ের আঙ্গুল কেটে ফেটে রক্তাক্ত হয়ে পড়ে। বুদ্ধের নিন্দা ছেড়ে দিয়ে সে এবার কান্নাকাটি করতে আরম্ভ করে।

এই অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঐ বিশাল জনসমাবেশে ঘটায় সবাই ষড়যন্ত্রের রহস্যটা বুঝতে পারে। সবাই ছি ছি করতে থাকে। অনেকে নিজেদের মধ্যে এই ঘটনার সমালোচনা করতে থাকে। অনেকে বুদ্ধের মহিমা প্রশংসা করতে থাকেন। আর ঐ সুযোগে চিঞ্চা মাণবিকা প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে পালানোর চেষ্টা করে। অনেকে তাকে ধরে শাস্তি দেবার উদ্দেশ্যে তার পেছনে ছোটে। জেতবন-বিহারের মুখ্য দরজার বাইরে যেই চিঞ্চা পা রেখেছে অমনি অবীচি নরকের আগুন বেরিয়ে আসে আর তাকে গ্রাস করে ফেলে। এ ঘটনাও সবার চোখের সামনে ঘটে।

[চিঞ্চা কর্তৃক কত মহামিথ্যা অভিযোগ সত্ত্বেও ভগবান বুদ্ধ যে উদার, শান্ত, ক্ষান্তি ও সৌম্যভাব অবলম্বনের মাধ্যমে মিথ্যাচারিনী দুষ্টা চিঞ্চাকে দমন করেছিলেন, সেই ধর্মের (সত্যের) প্রভাবে আপনাদের (বাচক ও শ্রোতার) জয় ও মঙ্গল সাধিত হউক। এ অধিষ্ঠানে (সত্যক্রিয়ার বাক্য) অসাধারণ কিছুই বলা হয় নি। অসত্যকে যদি সত্য দিয়ে দমন না করা যায়, তবে সত্যকে কেহ কেন ভরসা করবে? সব বর্জন করে কেহ কেন সত্যের শরণে যাবে?]

৬। **সচ্চং বিহায়মতি সচ্চক-বাদকেতুং,**
বাদাভিরোপিতমনং অতি-অন্ধভূতং।
পঞ্ঞাপদীপজলিতো[২০] জিতবা মুনিন্দো,
তন্তেজসা ভবতু তে জয়মঙ্গলানি।।

শব্দার্থ :

সচ্চং	-	সত্য (কে)
বিহায়	-	ছেড়ে (অসত্যের পোষাক ত্যাগ করে)
অতি	-	বেশি মাত্রায় (অভিমানী)
সচ্চক	-	সত্যক (নামক পরিব্রাজক)
বাদকেতুং	-	নামী বিবাদী (বিতর্কী) হবার ধ্বজা
বাদাভিরোপিতমনং	-	বাদ-বিবাদ পরায়ণ মনে
অতি অন্ধভূতং	-	ঘোর মোহান্ধ হয়ে
পঞ্ঞাপদীপ জলিতো	-	(তার অন্তরে) প্রজ্ঞাপ্রদীপ জ্বালিয়ে
জিতবা	-	জয়ী হয়েছিলেন
মুনিন্দো	-	মুনীন্দ্র, মুনিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

ভাবার্থ : অসত্যভাষী মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন বাদ-বিবাদ পরায়ণ, অতিমানী ও অন্ধতুল্য সত্যক নামক নির্গ্রন্থকে মুনীন্দ্র বুদ্ধ যে প্রজ্ঞাপ্রদীপ জ্বালিয়ে জয় করেছিলেন, ঐ ধর্মের (সত্য পারমিতার) তেজে আপনার জয় ও মঙ্গল সাধিত হউক।

---

[২০]। কোথাও 'পঞ্ঞাপদীপজ্জলিতো' -এর প্রয়োগ দেখা যায়।

পৃষ্ঠভূমি : সত্যক (সচ্চক) নামক ভয়ানক তার্কিকের পরাজয় ও বুদ্ধের শরণাপন্ন হওয়ার ঘটনাই এ গাথার মুখ্য বিষয়।[২১]

সত্যক ছিলেন বৈশালীবাসী একজন নির্গ্রন্থ (জৈন) পন্থী সন্ন্যাসী। তিনি ছিলেন প্রচণ্ড তার্কিক। শুধু তিনি নিজে তার্কিক ছিলেন, তা নয়। তাঁর মাতাপিতা উভয়ে এবং তাঁর চার বোনও ছিলেন তর্ক-শাস্ত্রে পারঙ্গতা। শাস্ত্রে উল্লেখ রয়েছে সত্যকের মাতা পিতারাও তাদের নিজেদের বিয়ের পূর্বে তর্কযুদ্ধে মুখোমুখী হয়েছিলেন। কেউ কাউকে পরাস্ত করতে না পারায় শেষ পর্যন্ত বিচার চলে যায় লিচ্ছবীদের হাতে। তাঁরা চিন্তা করেন--- দুজনই পণ্ডিত। এদের ভাবী সন্তান অবশ্যই একজন মহাপণ্ডিত হবেন। শেষে লিচ্ছবীগণের পরামর্শে তাঁরা উভয়ে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হন। লিচ্ছবীরাই তাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব বহন করেন।

সত্যকের পিতার গোত্র নাম অগ্নিবেশ্যায়ন আগ্নেয়হোত্রী অগ্নিবেশ্যক। পরবর্তীকালে তিনি সত্যক অগ্নিবেশ্যায়ন (সচ্চক অগ্নিবেস্সক) নামে খ্যাতি প্রাপ্ত হন।

তাঁর চার বোনের নাম ছিল-- সত্যা (সচ্চা), লোলা, অবধারিকা ও প্রতিচ্ছদা। মাতাপিতা উভয়ে কন্যাদের তর্কবিদ্যা শিক্ষাদানকালে বলেছিলেন যদি কোন গৃহীর কাছে পরাজিত হও তবে তার ভার্যা হবে, আর যদি কোন পরিব্রাজকের কাছে পরাজিত হও তবে তার কাছে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করবে। ঐ চার বোনেদের প্রত্যেকে এক এক করে অগ্রশ্রাবক সারিপুত্রের সাথে তর্কযুদ্ধ করেছিলেন। সবাই পরাজয় স্বীকার করে মায়ের শর্ত-পূর্তিতে বুদ্ধের আদেশে উৎপলবর্ণা থেরীর কাছে প্রব্রজিতা ভিক্ষুণীর দীক্ষা গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে তাঁদের প্রত্যেকে

---

[২১]। চূলসচ্চকসুত্ত ও মহাসচ্চকসুত্ত/ মজ্ঝিমনিকায়; আর জাতক-অট্ঠকথা দ্রষ্টব্য।

চরম ধ্যান-সাধনার লক্ষ্যে উন্নীত হন অর্থাৎ অরহত্বপদ প্রাপ্ত হন।

তাদের সবার ছোট ভাই ছিলেন ঐ সত্যক। তিনি লিচ্ছবীগণের শিক্ষক ছিলেন। তর্কবিদ্যায় নিপুণ হওয়ায় তাকে কেহ পরাস্ত করতে পারতো না। এ কারণে তার মধ্যে প্রচণ্ড আত্মাভিমান জন্মে। জনসমাজে উচ্চ প্রশংসিত হওয়ায় তিনি অভিমানে অন্ধ হয়ে পড়েছিলেন। বৈশালীতে তাঁর সঙ্গে শাস্তা সুগতের দুবার সাক্ষাৎ হয়। দু বারই সত্যক শাস্তার কাছে পরাজিত হন। এতে লিচ্ছবীগণের অন্যতম দুর্মুর্খ সত্যকের এই পরাজয়ের তুলনা এমন এক পা-ভাঙ্গা কাকড়ার সাথে করেছেন যার আর পুরানো জলাশয়ে ফিরে যাবার সম্ভাবনা ছিল না।

পরাজয় স্বীকার করার পর তিনি শাস্তা সুগতকে নিজ বাড়ীতে অন্ন গ্রহণের আমন্ত্রণ জানান। শাস্তা তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। এরপর হতে তিনি শাস্তার অনুগত শিষ্য হয়ে পড়েছিলেন।

[যে তেজশক্তির (সত্যের) প্রভাবে মহাভিমানীর ও মিথ্যাভাষীর মোহান্ধ-তুল্য সত্যককে তার হৃদয়ে প্রজ্ঞারূপী প্রদীপ জ্বালিয়ে শাস্তা সুগত দমন করেছিলেন, সেই সত্যের (তেজের) প্রভাবে আপনার বা আপনাদের (পাঠক বা শ্রোতা সমূহের) জয় ও মঙ্গল সাধিত হউক।

এতে সমালোচনার কিছুই নেই। সহিষ্ণুতার (ক্ষান্তি বা ক্ষমা ভাবের) মাধ্যমে বহু বিপজ্জনক ঘটনাকে দমন করা যায়। নিজে দুর্বল হয়েও অপর বলশালীর শরণাপন্ন হয়ে বিপদ এড়ানো যায়। এমন ঘটনার উদাহরণ শুধু অতীতেই নয়, বর্তমান সমাজেও প্রচুর পাওয়া যায়।

সত্যক্রিয়ার (অধিষ্ঠানের) দ্বারা ভগবান বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের প্রায় ২৫৫২ বছর পরও আজকের সন্তপ্ত মানুষ বহু সম্ভাব্য দুর্ঘটনাকে এড়িয়ে জীবন-লক্ষ্যে অগ্রসর হতে পারেন।]

৭। নন্দোপনন্দ-ভূজগং বিবিধং[২২] মহিদ্ধিং,
পুত্তেন থের-মুদগেন[২৩] দমাপয়ন্তো।
ইদ্ধূপদেস-বিধিনা[২৪] জিতবা মুনিন্দো,
তন্তেজসা ভবতু তে জয়মঙ্গলানি।।

শব্দার্থ :

নন্দোপনন্দ	-	নন্দোপনন্দ (নাম বিশেষ)
ভূজগং	-	নাগরাজকে
বিবুধং	-	পণ্ডিত (কে)
মহিদ্ধিং	-	মহাঋদ্ধিসম্পন্ন
পুত্তেন	-	(জিন ধর্ম-) পুত্রের মাধ্যমে
থের	-	স্থবির
মুদগেন	-	মৌদ্গাল্যায়নের মাধ্যমে
দমাপয়ন্তো	-	দমন করে
ইদ্ধূপদেস	-	ঋদ্ধিবলের প্রয়োগ করে ও উপদেশ দিয়ে
বিধিনা	-	বিধিবদ্ধভাবে
জিতবা	-	জয়ী হয়েছিলেন
মুনিন্দো	-	মুনীন্দ্র (বুদ্ধ)

---

[২২]। কোথাও 'বিবিধ' পাঠ মিলে।

[২৩]। সেক্ষেত্রে 'ভূজগেন' শব্দের প্রয়োগে অর্থ সিদ্ধ করা যায়।

[২৪]। কোথাও 'ইদ্ধোপদেস বিধিনা' প্রযুক্ত হতে দেখা যায়।

ভাবার্থ : ঋদ্ধিসম্পন্ন বিবুধ (পণ্ডিত) নন্দোপন্দ নামক ভূজঙ্গকে (নাগরাজ) মুনীন্দ্র নিজ পুত্র (তুল্য মহাশ্রাবক মহামৌদ্গাল্যায়ন) -এর মাধ্যমে যে মহাঋদ্ধিবল প্রদর্শন ও উপদেশ প্রদান করে জয় করেছিলেন, ঐ ধর্মের (সত্য/সত্যক্রিয়ার) তেজে আপনার জয় ও মঙ্গল সাধিত হউক।

পৃষ্ঠভূমি : এ গাথার কেন্দ্র বিন্দু হল নন্দোপনন্দ নামক দুর্দমনীয় ভূজঙ্গের (নাগরাজ) দমন ও তাঁর ত্রিশরণ-গমন কথা।[২৫]

একদিন সকালে ভগবান বুদ্ধ পাঁচশত ভিক্ষু সহ তাবতিংস (ত্রয়স্ত্রিংশ) দেবলোকে যাচ্ছিলেন। যাবার পথে তাঁদেরকে নন্দোপনন্দ নাগরাজের ভবনের উপর দিয়ে যেতে হয়েছিল। ঐ নাগরাজ তখন তার আহার গ্রহণে ব্যস্ত ছিলেন। বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষু-সংঘের তেজে তার স্বাভাবিক দিনচরিয়া (দিনচর্যা) বিঘ্নিত হয়। এতে তিনি রেগে যান। রাগে থাকতে না পেরে তিনি তাঁর দেহ দিয়ে সিনেরু-পর্বতকে পেঁচিয়ে ফেলেন। ফলে তাঁদের তাবতিংস স্বর্গ-গমনের পথ অবরুদ্ধ হয়। ঐ পথ বাধামুক্ত করার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপাল, ভদ্রিয় এবং রাহুল অর্হৎগণ এগিয়ে গিয়ে উদ্যোগী হবার জন্য বুদ্ধের অনুমতি চেয়েছিলেন।

শাস্তা তাঁদের কাউকে অনুমতি দেন নি। কিন্তু অগ্রশ্রাবক মহামৌদ্গাল্যায়ণ এ ব্যাপারে উদ্যোগী হওয়া মাত্রই, শাস্তা তাঁকে অনুমতি প্রদান করেন। শাস্তা ভাল মত জানতেন যে নন্দোপনন্দের (নাগরাজ) ঋদ্ধিশক্তিবলে সম্ভাব্য সব বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হবার ক্ষমতা মহামৌদ্গাল্যায়ন ছাড়া আর কারোর মধ্যে নেই। শাস্তার অনুমতি পেয়ে নন্দোপনন্দের দমনে প্রস্তুতি নেন। নন্দোপনন্দ ও মহামৌদ্গাল্যায়ন উভয়ে নিজ নিজ ঋদ্ধিবল প্রদর্শন করেন। এই ঋদ্ধি-

---

[২৫]। থেরগাথা ও এর অর্থকথার ভিত্তিতে ঘটনার বর্ণনা তৈরী করা হয়েছে।

বল প্রদর্শনের মহাযুদ্ধ অনেকক্ষণ চলে। অবশেষে মহামৌদ্গাল্যায়ন নিমেষে চতুর্থ ধ্যানে ধ্যানস্থ হন। চতুর্থ ধ্যানের ঋদ্ধি-বল প্রয়োগ করেন। মহামৌদ্গাল্যায়ন নন্দোপনন্দকে পরাস্ত করেন। নন্দোপনন্দের অভিমান বিনষ্ট হয়। মহামৌদ্গাল্যায়নের প্রয়াসে নন্দোপনন্দ ভগবান বুদ্ধের কাছে এসে শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং শাস্তার শিষ্যত্ব বরণ করেন। বুদ্ধ সশিষ্যবৃন্দ তাবতিংস (ত্রয়স্ত্রিংশ) দেবলোকে গেলে দেবগণের মধ্যে মহাহর্ষ প্রকটিত হয়। পরে জেতবনে ফিরে এসে শাস্তা ধর্মদেশনা দানকালে মহামৌদ্গাল্যায়ণের নন্দোপনন্দ মান-মর্দন-কথা শোনালে শ্রাবস্তী-বাসীগণও আনন্দিত হন। অনাথপিণ্ডদ ঐ ঘটনায় আনন্দিত হয়ে বুদ্ধপ্রমুখ বিশাল ভিক্ষু-সংঘকে সপ্তাহকাল-ব্যাপী অন্নপানীয়াদি দান দিয়ে নিজের আনন্দোচ্ছ্বাস ব্যক্ত করেছিলেন।

[শাস্তা যে প্রখর বুদ্ধিবলে জিনপুত্রবৎ অগ্রশাবক মহামৌদ্গাল্যায়নের ঋদ্ধি-বলের প্রয়োগের মাধ্যমে নন্দোপনন্দের মান-অভিমান দমন করিয়েছিলেন ঐ তেজ-প্রভাবে এ গাথার ভাণক (বাচক) ও শ্রোতাদের সবার অপার জয় ও মঙ্গল সাধিত হউক।]

৮। **দুগ্গাহদিট্ঠি ভুজগেন সুদট্ঠহত্থং,**
ব্রহ্মং বিসুদ্ধি[২৬] জুতিমিদ্ধি বকাভিধানং।
ঞাণাগদেন বিধিনা জিতবা মুনিন্দো,
তন্তেজসা ভবতু তে জয়মঙ্গলানি।।

শব্দার্থ :

দুগ্গাহদিট্ঠি	-	দুর্গ্রাহ্য (মিথ্যা-) দৃষ্টি (সম্পন্ন)
ভূজগেন	-	ভূজগ (নাগ) -এর মাধ্যমে
সুদট্ঠ-হত্থং	-	হাতে দংশিত হয়ে
ব্রহ্মং	-	ব্রহ্মাকে
বিসুদ্ধি-	-	বিশুদ্ধি-
জুতিং	-	জ্যোতি
ইদ্ধি	-	ঋদ্ধি
বকাভিধানং	-	বক নামক
ঞাণ	-	জ্ঞান (-রূপী)
অগদেন	-	ঔষধের প্রয়োগের মাধ্যমে
বিধিনা	-	বিধির দ্বারা
জিতবা	-	জয়ী হয়েছিলেন
মুনিন্দো	-	মুনীন্দ্র (বুদ্ধ)

[২৬] । কোথাও 'বিসুদ্ধিং' জুতিং পাঠ দেখা যায়।

ভাবার্থ : দুর্গ্রাহ্য মিথ্যাদৃষ্টিরূপী ভূজঙ্গ কর্তৃক দংশিত বিশুদ্ধ জ্যোতি ও দিব্য বল সম্পন্ন বক নামক ব্রহ্মাকে মুনীন্দ্র বুদ্ধ যে জ্ঞানরূপী ঔষধির প্রয়োগের মাধ্যমে জয় করেছিলেন, ঐ ধর্মের (সত্যক্রিয়ার) প্রভাবে আপনার জয় ও মঙ্গল সাধিত হউক।

পৃষ্ঠভূমি : এ গাথার কেন্দ্র-বিন্দু হল বক নামক এক ব্রহ্মার মিথ্যাদৃষ্টি বর্জন।[২৭]

দীর্ঘায়ুসম্পন্ন ঐ বক-ব্রহ্মার বদ্ধধারণা ছিল-- এ সংসার নিত্য, ধ্রুব ও শাশ্বত ও অবিনাশী। আর সেই এই সংসারের স্রষ্টা।

এক সময় ভগবান বুদ্ধ কোশল জনপদের উৎকৃষ্ট (উক্কট্ঠ) নগরীর সুভগবনে বিহার করছিলেন। অবসর সময়ে শাস্তা ঐ বক-ব্রহ্মার মিথ্যা ধারণার কথা জানতে পারেন। বক-ব্রহ্মার অনাগত জীবনে তাঁর ঐ মিথ্যা ধারণার দূরগামী দুষ্পরিণামের কথা ভেবে তা থেকে বক-ব্রহ্মাকে মুক্তি-দানের উদ্দেশ্যে মহাকারুণিক তথাগত বুদ্ধ বক-ব্রহ্মার নিবাসস্থানে অর্থাৎ আভাস্বর ব্রহ্মলোকে যান। বক-ব্রহ্মাকে তাঁর মিথ্যাদৃষ্টির কথা ধরিয়ে দেন।

শাস্তা তাঁকে বুঝিয়ে বলেন--- সংবর্তন-বিবর্তনের মাধ্যমে এ সংসার পরিবর্তনশীল থাকে। সংবর্তনকালে সংসার বিনাশের প্রক্রিয়ায় থাকে। এই প্রক্রিয়ায় নিম্নলোকের প্রাণীরা স্থানচ্যুত হয়ে মৃত্যুর পর ক্রমোত্তর উন্নত লোকে জন্মগ্রহণ করে থাকে। এভাবে ঐ সংবর্তন-কল্পের শেষ পর্যায়ে অধিকাংশ প্রাণীরা তাদের মৃত্যুর পর সুগতি প্রাপ্ত হয়ে আভাস্বর-ব্রহ্মলোকে জন্মগ্রহণ করেন। এরপর বিবর্ত-কল্প আসে। এ কল্পে সংসারে ব্রহ্মবিমানের সৃষ্টি হয়। তবে তা থাকে শূন্য অর্থাৎ

---

[২৭]। জাতক-অট্ঠকথা বক-ব্রহ্মা-জাতকের ভিত্তিতে প্রস্তুত করা হয়েছে।

তাতে কোন দেবপুত্র তখনও জন্ম গ্রহণ করে নি। ঐ সময় আভাস্বর-ব্রহ্মলোকের এক ব্রহ্মা তার আয়ুষ্কাল পূর্ণ হওয়ায় অথবা পুণ্যক্ষয়ের কারণে আভাস্বর-ব্রহ্মলোক হতে চ্যুত হয়ে ঐ শূন্য ব্রহ্মবিমানে আবির্ভূত হন। আভাস্বর-বিমানের অন্য ব্রহ্মাগণ ঐ ব্রহ্মার অনুগমন করেন। ঐ শূন্য ব্রহ্মবিমানে প্রথম আগন্তুক হওয়ায় অন্য সকলে তার অনুগমনকারী ছিলেন। ঐ ব্রহ্মা অন্য সব ব্রহ্মা অপেক্ষা অধিকতর দীর্ঘায়ুসম্পন্ন হওয়ায় তিনি নিজেকে ও ব্রহ্মবিমানকে নিত্য, ধ্রুব, শাশ্বত ও অবিনাশী বলে ভাবতে থাকেন।

বস্তুত তা নয়। এ মর্ত্যলোকে না মরে অমর হয়ে থাকে এমন কেহ নেই। কার্য-কারণ বিধানে সংস্কৃতধর্মের এমন কিছুই নেই যার পরিবর্তন হয় না। ধর্মদেশনার শেষে শাস্তা সুগত বলেন-- শূন্য ব্রহ্মবিমানের ঐ ব্রহ্মাই হলেন তিনি (বকব্রহ্মা)। ধর্মদেশনার প্রথম চরণে মারের প্রভাবে থাকায় বক-ব্রহ্মা তাঁর দৃষ্টিকে মিথ্যাদৃষ্টিরূপে স্বীকার করতে চান নি। বক-ব্রহ্মা তার ধারণা না বদলে সেখান হতে অন্তর্ধান হবার চেষ্টা করেন। কিন্তু শাস্তা তার মনের অবস্থা বুঝতে পেরে নিজের ঋদ্ধিবলের প্রভাবে তাকে অন্তর্ধান হতে দেন নি, তবুও অন্ধকারের আড়ালে শাস্তা নিজে অদৃশ্য হয়ে পড়েন।

ঐ অবসরে শাস্তা তাকে তার ঐ অতীত জন্মের ঘটনার কথা শোনান। ঐ জন্মে তার নাম ছিল কেশব।

আরেক ব্রহ্মারও এমন ধারণা ছিল। তার আরও ধারণা ছিল--- তার ঐ ব্রহ্মলোকে কোন ভিক্ষু বা পরিব্রাজক প্রবেশ করতে পারবে না। শাস্তা তার ঐ মিথ্যে ধারণার কথা জানতে পারেন। তার ঐ মিথ্যা ধারণাজনিত অহংকার চূর্ণ করার উদ্দেশ্যে ঐ ব্রহ্মলোকে যান আর বায়ুমণ্ডলে লেলিহান অগ্নিশিখায় বিরাজ করেন। শাস্তার সঙ্গে

মহাকাশ্যপ, কপ্পিফন, আর অনুরুদ্ধ অর্হৎ মহাস্থবিরগণও ছিলেন। কিন্তু শেষে ঐ মিথ্যা দৃষ্টি দূর হয়। এই মহান উপকারের জন্যে শাস্তার প্রতি তিনি কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করেন।

[যে জ্ঞানরূপী তেজপ্রভার (সত্যের/ ধর্মের) প্রভাবে সর্পদংশিত হাতের ন্যায় দুর্গ্রাহ্য মিথ্যাদৃষ্টি প্রভাবিত বক-ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রজ্ঞা-প্রদীপ জ্বলে উঠেছিল ঐ তেজের প্রভাবে এ গাথার পাঠক (বাচক) ও শ্রোতাগণের অপার জয় ও মঙ্গল সাধিত হউক।]

৯। এতাপি বুদ্ধ-জয়মঙ্গল-অট্ঠগাথা,
যো বাচকো দিনে দিনে সরতেমতন্দি।
হিত্বাননেক বিবিধানি চুপদ্দবানি,
মোক্খং সুখং অধিগমেয়্য নরো সপঞ্ঞো।।

শব্দার্থ :

এতাপি (এতা + অপি)	-	এই সব
বুদ্ধ-জয়মঙ্গল	-	বুদ্ধের জয় (গাথা) মঙ্গলময়
অট্ঠগাথা	-	আটটি গাথা
যো	-	যে
বাচকো	-	বাচক (আবৃত্তিকারী ভাণক)
দিনে দিনে	-	প্রতিদিন
সরতেমতন্দি (সরতে + অতন্দি)	-	তন্দ্রা শীল (অন্যমনা) না হয়ে স্মরণ (আবৃত্তি) করেন।
হিত্বান' নেক (হিত্বান + অনেক)	-	বর্জনীয় অনেক কিছু পরিত্যাগ পূর্বক
বিবিধানি	-	বিবিধ প্রকারের
চ	-	আর
উপদ্দবানি	-	উপদ্রব (সমূহ)
মোক্খং	-	মোক্ষ
সুখং	-	সুখ

অধিগমেয়্য	-	প্রাপ্ত হন
নরো	-	মানব (মাত্র)
সপঞ্ঞো	-	(ঐ) প্রজ্ঞাবান।

ভাবার্থ : যে বাচক (পাঠক বা আবৃত্তিকারী) বুদ্ধের এই জয়মঙ্গল-অষ্টগাথা (শ্রদ্ধা সহকারে) অতন্দ্রিত (এবং নিরলস) ভাবে প্রতিদিন স্মরণ করেন তিনি প্রজ্ঞাবান মানুষ। ঐ প্রজ্ঞাবান সত্ত্ব অনেক (বিবিধ) প্রকারের (অপ্রত্যাশিত) উপদ্রব (ঘাত-প্রতিঘাত) পরিত্যাগ পূর্বক বিমুক্তি ও বিবিধ প্রকারের (লৌকিক) সুখ এমন কি লোকোত্তর বিমুক্তি-সুখও প্রাপ্ত হন।

জয়মঙ্গল-অট্ঠগাথা অর্থাৎ ভগবান বুদ্ধের জয়সূচক লোককল্যাণকারী কীর্তি (-মঙ্গল) - কথাময় অষ্টগাথা নামক সূত্রে সর্বমোট নয়টি গাথা রয়েছে। এদের মধ্যে প্রথম আটটি গাথায় তাঁর অত্যধিক আশ্চর্যকর আটটি ঘটনার বর্ণনা অত্যন্ত সংক্ষেপে অর্থাৎ বিন্দুতে সিন্ধুবৎ করে প্রস্তুত করা হয়েছে। শেষের অর্থাৎ নবম গাথায় বুদ্ধের জীবনের কোন ঘটনা বর্ণিত হয় নি। এটিকে এ সূত্রের 'নিগমন-গাথা' -রূপে প্রয়োগ করা হয়েছে। এ গাথার মাধ্যমে এর আবৃত্তির ও শ্রবণের সুপরিণাম সম্পর্কে বাচক ও শ্রোতা উভয়কে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

পালি পিটক সাহিত্যের যত্র তত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বুদ্ধ-জীবনী সম্পর্কে যারা অভিজ্ঞ, তাদের পক্ষে ঐ সূত্রের কথাবস্তু বুঝতে কোন প্রকারের অসুবিধা হয় না। কিন্তু পালি ভাষায় অনভিজ্ঞ বাচক ও শ্রোতাদের সুবিধার জন্যে সূত্রের অন্তর্ভূক্ত প্রতিটি শব্দের অর্থ দেওয়া হয়েছে। তা সত্ত্বেও সূত্রটি গাথাবদ্ধ হওয়ায় অর্থ যতটুকু স্পষ্ট হওয়া উচিত ততটুকু হয় না। ঐ ঊনতা পূর্তির উদ্দেশ্যে শব্দার্থের ভিত্তিতে প্রতিটি গাথার ভাবার্থ প্রস্তুত করা হয়েছে। পালি সাহিত্যের বিভিন্ন

স্রোতে বুদ্ধের জীবনে ঘটিত ঐ সব আশ্চর্যকর ঘটনা যেভাবে বিক্ষিপ্ত রয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় শব্দার্থে বা ভাবার্থের কোনটিতে হয় না। ওসবের অভাবে বাচক ও শ্রোতার হৃদয়ে যে মাত্রার শ্রদ্ধার উদয় হওয়া উচিত ততটুকু হয় না। তার অভাবে সূত্র-শ্রবণের আয়োজন (কর্ম) আশানুরূপ সুফল দান করে না। সূত্র পঠন ও শ্রবণ জনিত পুণ্যকর্ম যাতে আশাতীত সুফল প্রসব করতে সমর্থ হয় তার জন্যে প্রয়োজন শ্রদ্ধারূপী শ্রেষ্ঠ সম্পত্তির। তার অধিকারী হতে হলে প্রয়োজন হয় প্রতিটি গাথায় বর্ণিত ঘটনার বিস্তারিত পৃষ্ঠভূমি সম্পর্কে অবহিত হওয়া। এ কারণে শব্দার্থ ও ভাবার্থ দানের পর তৃতীয় চরণরূপে পৃষ্ঠভূমি প্রদান করা হয়েছে।

পরিত্রাণ পাঠ ও (আমাদের) করণীয় কর্তব্য:

পরিত্রাণ-সূত্রের অন্তর্গত সব কটি বা যে কোন বিশেষ সূত্র-পাঠের আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য হল মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় বা এমন কি আন্তর্রাষ্ট্রীয় আপদ নিবারণ এবং তার সাথে জড়িত সবার হিত-সাধন, আর সুখ-সাধন, সংরক্ষণ ও সংবর্দ্ধন করা।

প্রাণীর জীবন ক্ষণস্থায়ী। প্রাণী-জগতের মাঝে মানব-জন্ম নেওয়াও একটি দুর্লভ ঘটনা। এই দুর্লভ জীবন কিছু জানা আর অধিকাংশ নানা অজানা ও অনিশ্চিত আপদ-বিপদময় থাকে। এত সব আপদ-বিপদ কাটিয়ে জীবনকে নির্জট করা, তাকে সুনিয়োজিত ভাবে সহজ-সরল করে লক্ষ্যপথে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া, আর সার্থক ও সুখান্তকর করতে পারাটা আরও অত্যধিক দুর্লভ ঘটনা।

এখানে প্রশ্ন উঠে এই ক্ষণ-স্থায়ী অনিশ্চিত জীবনটা এত আপদ-বিপদ-সঙ্কুল হয় কেন? বুদ্ধের কার্য-কারণ-নীতি অনুসারে এসব

আপদ-বিপদের কিছু কারণ বর্তমান জন্মজাত। আর অধিকাংশ আপদ-বিপদের কারণ অতীতের অনন্ত জন্ম-জাত। অসংখ্য অতীত জন্মের অসংখ্য অকুশল (পাপ) ও কুশল (পুণ্য) কর্মের অপেক্ষমান কর্ম-বিপাক এর কারণ। নিজ কৃত কর্ম ও কর্মবিপাকের কারণে এ জীবন আপদ-বিপদ-সঙ্কুল হওয়া সত্ত্বেও এসব আপদ-বিপদকে 'অজানা' বলা হয় কেন? অতীত জন্মের কর্ম ও কর্ম-বিপাক নিজ কৃত ও নিজ অর্জিত হলেও এক জন্মের মৃত্যুর পর পুনরায় জন্ম-গ্রহণ জনিত অসাধারণ ঘটনা ঘটার কারণে অধিকাংশ সাধারণ প্রাণীরা এমনকি দেবগণও ঐ সব কর্ম এবং কর্ম-বিপাক বিস্মৃত হয়। একারণে যারা ভুলে যান তাদের ঐ সব সৃজিত ও অর্জিত কর্ম ও কর্ম-বিপাককে 'অজানা' (ভাগ্য বা নিয়তি) শব্দে বিশেষিত করা হয়। এ জন্মের কর্ম ও সম্ভাব্য কর্ম-বিপাক কর্ম-কর্তার জানা থাকলেও কর্ম-বিপাকের মাত্রা ও ওসবের বিপাকদানের কাল অজানা থাকে। কিন্তু স্মৃতি-শক্তি প্রখর হলে এবং শমথ-বিপশ্যনার মাধ্যমে দিব্যদৃষ্টি ও দিব্যশ্রোত্র প্রাপ্ত সাধক-সাধিকাগণের কাছে কোন আপদ-বিপদই অজানা থাকে না। তবে কি অকুশল কর্মসমূহের দুঃখদায়ক কর্মবিপাক (আপদ-বিপদ) নিস্তেজ নির্বীর্যবান মূকপ্রাণীর ন্যায় নীরবে অনন্ত কাল ভোগ করা ছাড়া বিপন্মুক্তির আর কি কোন উপায় নেই? ঈশ্বরবাদীদের কাছে ঈশ্বর-ভক্তিই ঐ বিপন্মুক্তির একমাত্র পথ। ভৌতিকবাদীদের কাছে নীরবে সয়ে যাওয়া ছাড়া বিপন্মুক্তির আর কোন উপায় নেই।

বুদ্ধবচনে ঐ 'ঈশ্বর' অবধারণাই মিথ্যাদৃষ্টি মাত্র। তা শাশ্বতবাদকে পুষ্ট করে। অন্যদিকে ভৌতবাদ মতে পুনর্জন্মের অবধারণা না থাকায় তাতে উচ্ছেদবাদ পুষ্ট হয়। বুদ্ধশাসনে উভয়বাদই মিথ্যাদৃষ্টিতে আচ্ছন্ন। ঐ উভয়বাদে ব্যক্তির স্বাতন্ত্রতা ক্ষুণ্ন হয়। এতে ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয়।

এ পরিস্থিতিতে বুদ্ধের শুদ্ধ কর্মবাদই দুঃখী প্রাণীর বিপন্মুক্তির একমাত্র নির্ভরযোগ্য আশার কিরণ। বুদ্ধের মতে বর্তমান কুশল (পুণ্য) কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে অতীতের প্রাণী (কর্মকর্তা) অকুশল কর্ম-বিপাকের প্রভাবের মাত্রাকে দুর্বল করা সম্ভব। নিরন্তর সম্পাদিত কুশল (পুণ্য) কর্মজনিত সুখদায়ক-বিপাকের প্রভাবে অতীতের দুঃখদায়ক-বিপাকের প্রভাবকে ক্রমান্বয়ে ক্ষীণতর এবং প্রবলতর কুশল (পুণ্য) কর্ম-বিপাক (সুখ-) দায়ক কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে প্রবলতর দুঃখদায়ক অকুশল বিপাককে ক্রমশ ক্ষীণতর এবং কালান্তরে একেবারে নিষ্ক্রিয় করা সম্ভব। এভাবে প্রাণী বিশেষত মানুষ কোন পরিকল্পিত ঐশ্বরিক শক্তির আরাধনা না করেও কেবল নিজ কর্মশক্তির ভিত্তিতে তার জীবনকে পূর্ণত বিপন্মুক্ত করতে সমর্থ হতে পারে। শাস্তা সুগত বুদ্ধ তাঁর অতীতের অনন্ত বোধিসত্ত্বচর্যার অর্থাৎ জাতক-কথায় বর্ণিত বুদ্ধকারক পারমিতা-গুণের প্রভাবে নিজেকে মার (বাধাবিঘ্ন-) মুক্ত করে তা সিদ্ধ করেছেন। তাঁর আবিষ্কৃত ধর্ম (কর্মবাদ) বড়ই গম্ভীর ও পণ্ডিত বেদনীয়। অভিধর্মের ভাষায় তাঁর এই প্রতীত্যসমুৎপন্ন গম্ভীর কর্মবাদকে পণ্ডিত বেদনীয় করে তোলার প্রয়াস করা হয়েছে। সূত্রপিটকের অন্তর্গত সূত্রসমূহের দেশনার মাধ্যমে এই কর্মবাদকে বিভিন্ন বিধিতে বিভিন্নরূপে বোঝানো হয়েছে।

বুদ্ধদেশিত এমন একটি অতি জনপ্রিয় সূত্রের নাম হল 'মঙ্গল-সূত্র'। প্রাণীর বিশেষত মানুষের জীবনকে অমঙ্গল-সূচক আপদ-বিপদ হতে মুক্ত করে ক্রমশ পূর্ণত মঙ্গলময় করে তোলার বিধি-নির্দেশ দানই এই সূত্রের মুখ্য বিষয়। এ সূত্র মতে জীবনকে পূর্ণত মঙ্গলময় করে তুলতে হলে মানবকে আটত্রিশ প্রকারের মঙ্গল (পুণ্য-) কর্ম নিরন্তর সম্পাদন করতে হবে। ঐ আটত্রিশ প্রকার মঙ্গল-কর্মের মধ্যে কালান্তরে ধর্মশ্রবণ ও ধর্মদেশনা (চর্চা) করা দু-প্রকারের মঙ্গলকর্ম পরিত্রাণ-সূত্র

পাঠের মাধ্যমে বাচক (কর্মকর্তা) ধর্মদেশনাজনিত আর পরিত্রাণ-সূত্র শ্রবণের মাধ্যমে শ্রোতা (কর্মকর্তা) ধর্মশ্রবণজনিত মঙ্গল (পুণ্য)-কর্মসম্পাদন করে থাকেন।

কোন ঘটনা যতই আকস্মিক হউক না কেন, তা তার অনুকুল পরিস্থিতির উপস্থিতিতে হয়ে থাকে। কাজেই যে কোন মঙ্গল (পুণ্য)-কর্ম সম্পাদনের পূর্বে তার অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়োজন হয়। এর জন্যে প্রয়োজন হয় পূর্ব প্রস্তুতির। পূর্ব প্রস্তুতিতে প্রয়োজন হয় কিছু পূরক প্রত্যয়ের। এ ধরণের পূরক প্রত্যয়-ধর্ম মোটামুটি ভাবে দু-প্রকারের। ঐ দুটির প্রথমটি হল-- বাহ্য-পূরক প্রত্যয় অঙ্গ আর দ্বিতীয়টি হল অভ্যন্তর পূরক প্রত্যয় অঙ্গ। বাহ্য প্রত্যয়-ধর্ম বলতে এখানে মঙ্গল (পুণ্য)-অনুষ্ঠানের পূর্ব-প্রস্তুতি-সূচক দৃশ্যমান শ্রাব্যমান ও নাসিক্য সুগন্ধাধিবাসন দ্রব্যসম্ভার বোঝায়। যেমন- (১) ভূমি শুদ্ধিকরণ অনুষ্ঠান, (২) আসন শুদ্ধিকরণ অনুষ্ঠান, (৩) পাত্র শুদ্ধিকরণ অনুষ্ঠান, (৪) শারীরিক-মানসিক শুদ্ধিকরণ অনুষ্ঠান ও (৫) কর্মশুদ্ধিকরণ অনুষ্ঠান।

(১) ভূমি শুদ্ধি : ভূমি-শুদ্ধি বলতে যে ভূমিতে বা যে প্রাঙ্গণে বা যে আবাসে বসে কোন প্রকারের মঙ্গল (পুণ্য)-অনুষ্ঠান করা হবে, ঐ ভূমি বিশেষের শুদ্ধি বোঝায়। এর অঙ্গ হিসেবে ঐ বিশেষ ভূমি-ভাগের বা বাস-ভবনের শোধন, রং-বেরঙ্গের ধ্বজা-পতাকা, পত্র-পুষ্পাদি দিয়ে আর ঢোল-করতাল, মৃদঙ্গ-ঘন্টা বা শঙ্খাদি বাজিয়ে মঙ্গল (পুণ্য)-অনুষ্ঠান বিজ্ঞাপক এবং অংশগ্রহণকারীদের সুদৃষ্টি আকর্ষক মঙ্গল-ধ্বনি দানকে অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে।

(২) আসন শুদ্ধি : আসন-শুদ্ধি বলতে এখানে যে আসনে বসে বাচক (ভিক্ষু-ভিক্ষুণী) মঙ্গল (পুণ্য)-অনুষ্ঠান বা পরিত্রাণ সূত্র-পাঠ করবেন

তার শুদ্ধিকে বোঝায়। পুণ্যানুষ্ঠান সঞ্চালন বা পরিত্রাণ-সূত্র বাচন-কালে যাতে বারংবার আসন স্থানান্তরণজনিত অবরোধের কারণে সঞ্চালকের বা বাচকের একাগ্রতা বিঘ্নিত না হয় এমন অঙ্গ-পূরক ক্রিয়া-কলাপ এ প্রসঙ্গে আসন-শুদ্ধি শব্দে সূচিত হয়। মণ্ডপ সাজ-সজ্জা, মঙ্গলঘট-স্থাপনা ও পুণ্যানুষ্ঠান সঞ্চালক বা পরিত্রাণ-সূত্র বাচকের আসন-সংরক্ষণাদি কার্যকে এর অন্তর্ভূক্ত করা অত্যাবশ্যক। মঙ্গলঘট-স্থাপনার ক্ষেত্রে যে সতর্কতা অবলম্বন অত্যাবশ্যক সেটি হল মঙ্গলঘটের আসনের উচ্চতার জ্ঞান। মঙ্গলঘট হল ত্রিরত্নের প্রতীক। ভগবান বুদ্ধের অনুগামীদের কাছে ত্রিরত্ন হল সর্বাধিক সম্মানের পাত্র। কাজেই এ তিনের প্রতীকাত্মক 'মঙ্গলঘট'কে যেখানে সেখানে রাখা যেতে পারে না। তা করা হলে ত্রিরত্নের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করা হবে। পরিণামে হিতের স্থলে অহিত সাধিত হতে পারে। তা যাতে না হয় তার জন্যে মঙ্গলঘটের আসন পুণ্যানুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী উপাসক-উপাসিকদের আসন হতে পৃথক ও সামান্য উঁচু হওয়া আবশ্যক। নির্মল জলে ঘট ভরে নিয়ে পত্র-পুষ্পে সাজিয়ে ধূপ-দীপ জ্বালিয়ে তার চারপাশে চন্দনাদির সুবাসিত চূর্ণ ছড়িয়ে মঙ্গলঘটের আসন তৈরী করতে হয়।

(৩) পাত্র শুদ্ধি : পাত্র-শুদ্ধি বলতে মঙ্গল (পুণ্য) - কর্মে শরীক (অংশ গ্রহণকারী) বিশেষত পুণ্যার্থীদের আর পরিত্রাণসূত্র পাঠের প্রসঙ্গে এর বাচক ও শ্রোতা উভয়বর্গের অন্তর্গত পাত্র-পাত্রীদের অর্থাৎ তাদের শুচিতা অর্জনের অঙ্গপূরক ক্রিয়া-কর্মকে বোঝায়। এমন শুচিতা মোটামুটি তিন প্রকারের শারীরিক, মানসিক ও শারীরিক-মানসিক শুচিতা।

স্নানাদির পর পরিষ্কার বস্ত্রাদি পরিধান করে মঙ্গলানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা, স্নানাদি সম্ভব না হলে অন্ততপক্ষে মুখ আর হাত-পা ধুয়ে-মুছে

অংশগ্রহণ করা প্রয়োজন। পরিষ্কার মেঝেতে পরিষ্কার চাদর বিছিয়ে বসার পরম্পরা চিরাচরিত হয়ে আসছে। পরিত্রাণ-সূত্রের বাচকের আসন শ্রোতাদের আসন হতে তফাতে থাকাই বাঞ্ছনীয়। একটু উঁচু হলে আরও ভাল। বাচক আসনের কাছে আসলে শ্রোতাদের উচিত উঠে দাঁড়িয়ে 'সাধু'বাদ সহকারে হাতজোড় করে অভিবাদন করা। বাচক আসন গ্রহণ করলে শ্রোতারা সংযমতার ও শালীনতার সাথে নিজ নিজ আসনে বসবেন।

মানসিক শুদ্ধি : বাচক ও শ্রোতা উভয় বর্গের অন্তর্গত পাত্র-পাত্রীর উচিত ত্রিরত্ন বিশেষত দেব-মানবের লোকনায়ক মহাকারুণিক তথাগত বুদ্ধের প্রতি এবং পুণ্যানুষ্ঠানের (পরিত্রাণ-সূত্র-পাঠ) সুখদায়ক বিপাকের অভিন্ন সম্পর্কে অটুট আস্থা (শ্রদ্ধা) স্থাপন এর উৎকর্ষ সাধন করতে হবে।

(৪) শারীরিক-মানসিক শুচিতা : শারীরিক ও মানসিক দুভাবে শুচিতা অর্জনের পর এবার শ্রোতাদের কর্তব্য ঐ দুয়ের সমন্বয়ে যৌথ উদ্যোগে কায়িক-মানসিক শুচিতা অর্জন করা। এই অঙ্গ-পূর্তির উদ্দেশ্যে শ্রোতাদেরকে (উপাসক-উপাসিকা) ত্রিশরণ সহ পঞ্চশীল গ্রহণের পারম্পরিক প্রথা অনুসারে যাচনা জানিয়ে তা গ্রহণ করতে হয়। এরপর বাচকের কাছে পরিত্রাণ-সূত্র-পাঠের অনুরোধ ও পারম্পরিক প্রথায় করতে হয়। এভাবে শ্রোতারা কায়িক, বাচসিক ও মানসিক দিতে থেকে পাত্রতা অর্জন করেন।

(৫) কর্মশুদ্ধি : এ প্রসঙ্গে কর্ম-শুদ্ধি বলতে মূল কর্ম অর্থাৎ পরিত্রাণ-পাঠের পূর্বে বাচকের

(ক) প্রথম কর্তব্য নিজের শীলশুদ্ধি সম্পর্কে সচেতন হওয়া।

(খ) দ্বিতীয় কর্তব্য হল ত্রিরত্নে বিশেষত বুদ্ধবাণীর সত্যতায় অটুট

আস্থা স্থাপন করা।

(গ) তৃতীয় কর্তব্য হল বিশ্বের সকল প্রাণীর প্রতি অসীম মৈত্রী ভাব পোষণ ও প্রেষণ করা।

(ঘ) চতুর্থ কর্তব্য হল সূত্রের বা সূত্রসমূহের অন্তর্গত শব্দসমূহের সুন্দর ও স্পষ্ট ভাবে, অর্থ জেনে জেনে এবং তা ছন্দে উচ্চারণ করা।

(ঙ) সূত্রপাঠ শেষে শ্রোতাদের দিয়ে দৃশ্য বা অদৃশ্য বিশ্বের সকল শ্রেণীর হিতকামী হয়ে তাদের উদ্দেশ্যে পুণ্যদানের প্রতীকরূপে জল ঢেলে পুণ্য প্রদান করা।

(চ) পরিত্রাণ-সূত্র (বুদ্ধবাণী) শ্রবণ-কার্যে অংশগ্রহণকারী হবার সাক্ষী স্বরূপ পরিত্রাণ-সূত্র (তিন নাল করা হলুদ সুতো শ্রোতাদের ডান হাতে বেঁধে তা গলায় পড়িয়ে দেওয়া। এই পরিত্রাণ-সূত্র (সূতো) এর ধারক-ধারিকাকে নানাবিধ আপদবিপদ হতে রক্ষাকবচের ন্যায় রক্ষা করে। এর ধারককে অপদেবতারাও স্পর্শ করতে পারে না।

(ছ) জলপূর্ণ মঙ্গলঘট হতে মন্ত্রপূত-জল পুণ্যানুষ্ঠানে উপস্থিত ও পুণ্যার্থী সকলকে দিয়ে তা পান করানো। এই মন্ত্রপূত-জল ঔষধিবৎ ক্রিয়া করে। এর প্রভাবে নানাবিধ দুরারোগ্য শারীরিক ও মানসিক রোগ-ব্যাধি দূরীভূত হয়।

(জ) ঐ জলের কিছু অংশে আরও সামান্য জল মিশিয়ে তা ঘরের বা বাসস্থলের কোণায় কোণায় ছিটিয়ে দেওয়া।

(ঝ) ঐ মন্ত্রপূত-জলের অবশিষ্ট অংশ পরিষ্কার পাত্রে সুরক্ষিত রাখা যাতে ভবিষ্যতে অন্য আগ্রহী মানুষদেরও তা বিতরণ করা যেতে পারে।

শ্রদ্ধার ভূমিকা :

পুণ্যার্থী মাত্রেরই কাছে শ্রদ্ধা পুণ্য-বর্দ্ধকের ভূমিকা পালন করে। এই শ্রদ্ধা কি? কোথায় এর বাস? এর কাজ কি? শ্রদ্ধা মানবজীবনের এক অভিন্ন অঙ্গ। মানব-জীবনের পরমলক্ষ্য প্রাপ্তিতে তা এক আবশ্যিক পূরক অঙ্গের ভূমিকা পালন করে। মানবের অন্তর (মানস) জগতে এর বাস। অচর্চায় এর মান-মাত্রা হ্রাস প্রাপ্ত হয়। নিয়ত ও নিরন্তর চর্চায় তা বিকশিত হয়।

এর কাজ হল কলূষিত মনকে (চিত্ত) নির্মল করা। প্রদুষিত জলে ফিটকিরি দেওয়া হলে তা যে ভাবে জলকে নির্মল করে, অনুরূপভাবে কলুষিত চিত্তে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হলে তা চিত্তকে নিমেষে নির্মল করে। কিভাবে তা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়? শ্রদ্ধার উৎকর্ষ সাধনের নিকট ও দূরগামী পরিণাম কি? ইত্যাদি প্রশ্নের সমাধান প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে।

'শ্রদ্ধা' শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ হল যা সম্যক্ রূপে মনকে ধারণ করে তা 'শ্রদ্ধা' শব্দে সূচিত হয় (সম্মা দহতীতি সদ্ধা)। মানুষের মানস-জগতের (নাম) অন্তর্গত চিত্তের (মন) সহভূ, সহগামী ও সহবিনাশশীল বায়ান্ন (৫২) প্রকার চৈতসিক (মানসিক প্রবৃত্তি) ধর্মের এক অন্যতম চৈতসিক হল শ্রদ্ধা (সদ্ধা)। এটি একটি শোভন চৈতসিক। শ্রদ্ধা ও পুণ্যের মধ্যবর্তী সম্বন্ধ মুরগী ও ডিমের সম্বন্ধের ন্যায় অভিন্ন। শ্রদ্ধার মাত্রা বাড়ালে পুণ্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। আবার পুণ্যবৃদ্ধিতে শ্রদ্ধার মান আর মাত্রা বাড়ে।

এ শ্রদ্ধাই সমস্ত প্রকারের মঙ্গল-কর্মের পুরোগামী চৈতসিক ধর্ম (প্রত্যয়)। এর অভাবে কোন পুণ্য-কর্মের সম্পাদন সম্ভব নয়। এ কারণে আলবক যক্ষের (মানুষের শ্রেষ্ঠ ধন কি?) প্রশ্নের উত্তরে শাস্তা সুগত বলেছিলেন--- শ্রদ্ধাই ব্যক্তির শ্রেষ্ঠতম ধন। এক অন্য সূত্রে

(ওঘ-সূত্র) শাস্তা উপদেশ দানচ্ছলে বলেছেন--- পারগামী ব্যক্তি যেমন নৌকোর সাহায্যে বন্যার জলে প্লাবিত নদীকে উত্তীর্ণ করে অপর পারে যেতে পারে, অনুরূপভাবে জীবনের সম্ভাব্য সব আপদ-বিপদ হতেও ব্যক্তি শ্রদ্ধা-সম্পত্তির উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে নিজেকে মুক্ত করাতে পারে **(সদ্ধায় তরতি ওঘং)**। শ্রদ্ধা সহকারে যৎসামান্য পুণ্য কর্ম সম্পাদিত হলেও তা মহান ফল প্রদান করে ***(সদ্ধায় দিন্ন-দানং মহপ্ফলং হোতি)***।

"সব্বে সত্তা সুখী হোন্তু,
সব্বে হোন্তু চ খেমিনো;
সব্বে ভদ্রানি পস্সন্তু,
মা কিঞ্চি পাপমাগম্ম।"

সমাপ্ত

গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

নাম	ঃ	ড. ভিক্ষু সত্যপাল
পিতার নাম	ঃ	ঁবিনোদ বিহারী বড়ুয়া
মাতার নাম	ঃ	শ্রীমতী যুথিকা রাণী বড়ুয়া
জন্ম স্থান	ঃ	হলদিবাড়ী চা বাগান জলপাইগুড়ি (প. ব.)
জন্ম তারিখ	ঃ	০১. ০৩. ১৯৪৯

শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ত্রিপিটক বিশারদ (স্বর্ণ-পদক প্রাপ্ত)
এম. ফিল., পি. এইচ. ডি. (দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়)

পেশা ঃ অধ্যাপনা, বৌদ্ধ অধ্যয়ন বিভাগ
দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৮১ হতে -)
বর্তমানেঃ বিভাগীয় প্রধান

প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ (১) তেলকটাহগাথা (বঙ্গানুবাদ সহ)
(২) খুদ্দক-পাঠ (ইংরেজী ও হিন্দী অনুবাদ সহ)
(৩) কচ্চায়ণ-ন্যাস (১ম ভাগ)
(৪) ধম্ম-সংগহ (১ম ভাগ)
(৫) বাবাসাহেব ড. আম্বেদকর,
(৬) বৌদ্ধ ভারত ও পশ্চিমবঙ্গে বাঙ্গালী বৌদ্ধ সমাজ
(৭) শরণ-গ্রহণের পরম্পরা
(৮) বুদ্ধের দিব্যদৃষ্টি ও আজীবিক উপক

গ্রন্থ-সম্পাদনা ঃ (১) 'মৈত্রী' স্মরণিকা (১৯৮২)
(বুদ্ধ ত্রিরত্ন মিশন, দিল্লী)
(২) 'ভিক্ষু-পরিবাস' স্মরণিকা (১৯৮৯)
(ভারতীয় সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভা)।
(৩) 'ধম্মচক্কং' স্মরণিকা (১৯৯৩ - ২০০৯)
(বুদ্ধ ত্রিরত্ন মিশন, দিল্লী)
(৪) 'The Buddhist Studies' –Journal of
Department of Buddhist Studies
University of Delhi, Delhi - 110007

প্রকাশনার অপেক্ষায় (গ্রন্থ ও নিবন্ধ) ঃ ১৮ টির পাণ্ডুলিপি তৈরী
(বাংলা, ইংরেজী ও পালি ভাষায়)

Jayamaṅgal Aṭṭhagāthā

It is one of the *suttas* described in the *Paritasutta* by the Buddha. The title of the text suggests there are eight *gāthās* (verses) describing eight most powerful events that of those occurred in the life of the Buddha. They are as follows:

a. Defeat of the Girimekhala, the ferocious elephant of māra.
b. Defeat of māra by the power of the Buddha.
c. Controlling the ferocious elephant Nālāgiri by the compassionate touch of the Buddha.
d. Conversation of Angulimāla as a monk by the power of the Buddha.
e. Restarting Chincchmanvika who falsely charged to being pregnanted by the Buddha.
f. Overpowering Sacchaka, a great debater of the time by the wisdom of the Buddha.
g. Controlling very ferocious snake by the miraculous power of Thera Modgalayana who was inspired by the Buddha to do so.
h. Defeating a Brahma known as Vaka, who possessed strong wrong views, by the power of the Buddha.

These are the contents of *Jaimangalatthagāthā*. Tripitaka literature and their commentaries describe the miraculous power of changing this *Paritasutta*, if chanted devotionally. In Srilanka, Thailand, Myanmar (Burma), the Buddhist families chants devotionally this *sutta*. Realizing the importance of this *sutta* (*parita*) the author of this book has translated this *sutta* in Benguali language, making it easier and understandable to common readers. The book is also useful for students and researchers, since each and every words of the *sutta* has been translated from original Pāli source. Besides all these importance he has given very illustrative introduction highlighting the importance of the *sutta* based on the Pāli commentary.

"Wherever the Buddha's teachings have flourished,

either in cities or countrysides,

people would gain inconceivable benefits.

The land and people would be enveloped in peace.

The sun and moon will shine clear and bright.

Wind and rain would appear accordingly,

and there will be no disasters.

Nations would be prosperous

and there would be no use for soldiers or weapons.

People would abide by morality and accord with laws.

They would be courteous and humble,

and everyone would be content without injustices.

There would be no thefts or violence.

The strong would not dominate the weak

and everyone would get their fair share."

~THE BUDDHA SPEAKS OF
THE INFINITE LIFE SUTRA OF
ADORNMENT, PURITY, EQUALITY
AND ENLIGHTENMENT OF
THE MAHAYANA SCHOOL~

With bad advisors forever left behind,
From paths of evil he departs for eternity,
Soon to see the Buddha of Limitless Light
And perfect Samantabhadra's Supreme Vows.

The supreme and endless blessings
of Samantabhadra's deeds,
I now universally transfer.
May every living being, drowning and adrift,
Soon return to the Pure Land of Limitless Light!

*** The Vows of Samantabhadra ***

I vow that when my life approaches its end,
All obstructions will be swept away;
I will see Amitabha Buddha,
And be born in His Western Pure Land of
Ultimate Bliss and Peace.

When reborn in the Western Pure Land,
I will perfect and completely fulfill
Without exception these Great Vows,
To delight and benefit all beings.

*** The Vows of Samantabhadra Avatamsaka Sutra ***

DEDICATION OF MERIT

May the merit and virtue
accrued from this work
adorn Amitabha Buddha's Pure Land,
repay the four great kindnesses above,
and relieve the suffering of
those on the three paths below.
May those who see or hear of these efforts
generate Bodhi-mind,
spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
and finally be reborn together in
the Land of Ultimate Bliss.
Homage to Amita Buddha!

NAMO AMITABHA

南無阿彌陀佛

《孟加拉文：JAYAMANGALA ATTHAGATHA,
吉祥經中的八個故事》

財團法人佛陀教育基金會 印贈
台北市杭州南路一段五十五號十一樓
Printed and donated for free distribution by
The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation
11F., 55 Hang Chow South Road Sec 1, Taipei, Taiwan, R.O.C.
Tel: 886-2-23951198 , Fax: 886-2-23913415
Email: overseas@budaedu.org
Website: http://www.budaedu.org

This book is strictly for free distribution, it is not for sale.
এই বই সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিতরণের জন্য, বিক্রয়ের জন্য নহে।

Printed in Taiwan
7,000 copies; April 2013
BA043 - 11143